লেখমালা

ড: হরপ্রসাদ মিত্র

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VII vide T.B. Number 76/7/TB/78 dated 24.12.76 and also Board's Letter No. RB/76/DS/1 dt 24.12.76.

লেখমালা

[দ্বিতীয় ভাগ]

সপ্তম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, এম. এ. পি-এইচ. ডি.
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী
৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ১৯৭৪
সংশোধিত মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৭৬

প্রকাশক
শ্রীকৃপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বি.এ.
ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী
৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীভূমি মুদ্রণিকা
৭৭ লেনিন সরণী, কলিকাতা ১৩

মূল্য ১·৯০ টাকা

ভারত সরকারের আনুকূল্যে প্রাপ্ত সুলভ মূল্যের কাগজে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

রামমোহন—যেমনটি তাঁহাকে দেখিয়াছি



—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে বলিয়াছেন 'ভারতপথিক'। নব্যভারতের অন্যতম স্রষ্টা রামমোহন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার ভাবশিষ্য। কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি রামমোহনের সহিত ব্যক্তিগত পরিচয় সূত্রে তাঁহার চরিত্র চিত্রণ করিয়াছেন।]

শৈশবকাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংস্রব। আমি তাঁহার স্কুলে পড়িতাম। তখন আরও ভাল স্কুল ছিল, হিন্দু কলেজ ছিল। কিন্তু আমার পিতা রামমোহন রায়ের অনুরোধে আমাকে ঐ স্কুলে দেন। স্কুলটি হেদুয়ার পুষ্করিণীর ধারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজার পুত্র রমাপ্রসাদ আমার সঙ্গে এক শ্রেণীতে পাঠ করিতেন। আমি প্রায় প্রতি শনিবার দুইটার সময় ছুটি হইলে রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত রামমোহন রায়ের মাণিকতলার বাগানে যাইতাম। অন্য দিনও দেখা করিয়া আসিতাম। কোন কোন দিন আমি তথায় গিয়া বড়ই উপদ্রব করিতাম। বাগানের গাছের নিচু ছিঁড়িয়া, কখনো কড়াইশুঁটি ভাঙিয়া মনের সুখে খাইতাম। রামমোহন রায় একদিন কহিলেন, "বেরাদর! রৌদ্রে হুটোপাটি করিয়া কেন বেড়াও, এইখানে বোসো। যত নিচু খেতে পার এখানে বসিয়া খাও।" মালীকে বলিলেন, "যা, গাছ

থেকে নিচু পেড়ে নিয়ে আয়।" সে তৎক্ষণাৎ এক থালা ভরিয়া নিচু আনিয়া দিল। তখন রামমোহন রায় বলিলেন, "যত ইচ্ছা নিচু খাও।"

তাঁহার মূর্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর। আমি বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাঁহাকে দেখিতাম। বাগানে একটা কাঠের দোলা ছিল। রামমোহন রায় অঙ্গচালনার জন্য তাহাতে দোলা খাইতেন। আমি বৈকালে বাগানে গেলে তিনি আমাকে সেই দোলায় বসাইয়া আপনি টানিতেন; ক্ষণেক পরে আপনি তাহাতে বসিয়া বলিতেন, "বেরাদর! এখন তুমি টান!"

রাজা আমাকে ভালবাসিতেন। আমার যখন ইচ্ছা রাজার নিকট যাইতে পারিতাম। একদিন প্রাতঃকালে আহারের সময় মধু দিয়া রুটী খাইতে খাইতে তিনি আমাকে বলিলেন, "বেরাদর, আমি মধু ও রুটী খাইতেছি, কিন্তু লোকে বলে আমি গোমাংস ভোজন করিয়া থাকি।" কোন কোন দিন রাজার স্নানের সময় তাঁহার বাটী যাইতাম। তাঁহার স্নান বড় চমৎকার ছিল। তিনি স্নানের পূর্বে সমস্ত শরীরে অধিক পরিমাণে সরিষার তৈল মর্দন করিতেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁহার মাংসপেশীসমূহ শক্ত ছিল। তৈল-মর্দিত অনাবৃত দেহ, কটিদেশের চতুষ্পার্শ্বে একখণ্ড বস্ত্রমাত্র; তাঁহার এই প্রকাণ্ড মূর্তি দেখিয়া বালক বলিয়া আমার মনে ভীতিসঞ্চার হইত। এই প্রকার বস্ত্র পরিধান করিয়া বলপূর্বক পদনিক্ষেপ করিতে করিতে তিনি উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিতেন। সংস্কৃত, পার্শী ও আরবী ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি একটি প্রকাণ্ড জলপূর্ণ টবে ঝম্প প্রদান করিতেন। এই টবে তিনি এক ঘণ্টার অধিক কাল থাকিতেন। এই সময়ে তিনি ক্রমাগত তাঁহার প্রিয় কবিতাসকল আবৃত্তি করিতেন।

রাজার এমন শক্তি ছিল, যদ্দ্বারা তিনি সকল প্রকার লোককে আকর্ষণ করিতে পারিতেন। আমার উপর তাঁহার এক নিগূঢ় প্রভাব ছিল। আমি তখন বালক ছিলাম, সুতরাং তাঁহার সহিত কথোপকথনের সুযোগ ছিল না। কিন্তু আমার উপরে তাঁহার মুখের এমন এক আকর্ষণ ছিল যে, আমি আর কাহারও মুখ দেখিয়া কখনও আকৃষ্ট হই নাই।

আমি প্রায়ই রাজার গাড়ীতে রাজার সহিত যাইতাম। তখন রাজার সহিত আমার প্রায়ই কোন কথাবার্তা হইত না। আমি তাঁহার সম্মুখে বসিয়া তাঁহার সুন্দর মুখ দর্শন করিতাম। তাঁহার মুখের প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইতাম। রাজার সহিত গাড়ীতে বেড়াইবার সময় আমি প্রায়ই রাজার বিষয়ে চিন্তাতে মগ্ন থাকিতাম। রাস্তায় কি হইতেছে সে বিষয়ে

কিছু জানিতে পারিতাম না। আমি পুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতাম। কেবল রাজাকে দেখিতাম। আমার হৃদয় এক প্রকার গভীর ও অবর্ণনীয় ভাবে পরিপ্লুত হইত।

তিনি আমাকে কখনও কথা কহিয়া উপদেশ দেন নাই। আমি তখন বড় ছোট ছিলাম। তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ লইবার সময় হয় নাই। অথচ আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, আমার উপর তাঁহার এক নিগূঢ় প্রভাব ছিল। যে কার্যের জন্য তিনি পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, সেই কার্যের জন্য পরিশ্রম করিবার উৎসাহ আমি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি।

ইংলণ্ড গমন করিবার সময় রাজা আমার পিতার নিকট বিদায় লইতে আসিলেন। আমাদের বাড়ীর সকলে এবং আমাদের অনেক প্রতিবেশী রাজাকে দেখিবার জন্য আমাদের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে একত্র হইয়াছিলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। তখন আমি সামান্য বালক। তথাচ, রাজা আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার হস্তমর্দন না করিয়া তিনি এদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমার পিতা আমাকে ডাকাইয়া আনিলেন। তখন রাজা আমার হস্তমর্দন করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। রাজা যে সস্নেহে আমার হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ও অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই। বয়স অধিক হইলে উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি।

যখন রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু-সংবাদ আসিল, তখন আমি আমার পিতার নিকটে ছিলাম। আমার পিতা বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমারও অতিশয় শোক হইয়াছিল। যদিও রাজার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না, যদিও তিনি আমাকে কোন উপদেশ দেন নাই, তথাচ তাঁহার মুখশ্রী এবং চরিত্র আমার হৃদয়ে গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। তাহাদ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১। বালক দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে রাজা রামমোহনের যে চরিত্র পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে গুছাইয়া বল।

২। দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহনকে বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন, আবার খুব সহজভাবে তাঁহার সহিত মিশিতেন—ইহা কিভাবে সম্ভব হইল?

৩। 'লোকে বলে আমি গোমাংস ভোজন করিয়া থাকি।' —রামমোহনের এই কথার মধ্যে যে ক্ষোভ প্রকাশ পাইয়াছে তাহার তাৎপর্য বুঝাইয়া বল।

৪। 'যত ইচ্ছা নিচু খাও' ও 'বেরাদর! এখন তুমি টান!' —এই কথার মধ্যে রামমোহনের যে স্নেহের ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝাইয়া দাও।

৫। রামমোহন বহুভাষাভাষী ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন—এই প্রবন্ধে ইহার পরিচয় কিভাবে জানা যায়?

৬। রাজার সুন্দর মুখের আকর্ষণ দেবেন্দ্রনাথের জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল?

৭। 'যে কার্যের জন্য তিনি পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, সেই কার্যের জন্য পরিশ্রম করিবার উৎসাহ আমি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি।' —কোন্ কার্যের জন্য কে পরিশ্রম করিয়াছেন? ইহা আলোচ্য পংক্তির বক্তাকে কিভাবে প্রভাবিত করিয়াছে?

৮। 'বয়স অধিক হইলে উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি।' —কিসের অর্থ, কে, কিভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন?

৯। মানুষের মুখশ্রীর সহিত তাহার চরিত্রের যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা এই প্রবন্ধ পড়িয়া কিভাবে বুঝা যায়?

১০। অর্থ লিখ :— উপদ্রব, প্রশস্ত, অনাবৃত, ভীতিসঞ্চার, অবর্ণনীয়, পরিপ্লুত, পুত্তলিকা, হস্তমর্দন।

১১। বানান শিখ :— পুষ্করিণী, মাংসপেশী, প্রশস্ত, চতুষ্পার্শ্ব, মূর্তি, বক্ষঃস্থল, তৎক্ষণাৎ, আকর্ষণ, অবর্ণনীয়, ঘনিষ্ঠতা, অনুপ্রাণিত, প্রাতঃকাল।

১২। বাক্য রচনা কর :—হুঁটোপাটি, অনাবৃত, প্রশস্ত, ভীতিসঞ্চার, বলপূর্বক, অবর্ণনীয়, সুপ্রশস্ত, অনুপ্রাণিত, ক্রমাগত, নিগূঢ়।

১৩। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :— যদ্দ্বারা, সম্মুখে, ক্রমাগত, চতুষ্পার্শ্ব, কথোপকথন।

১৪। টীকা লিখ :— হিন্দু কলেজ, হেদুয়ার পুষ্করিণী।



অদ্ভুত আতিথেয়তা

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

['বঙ্গসাহিত্যের জনক' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। বাংলা গদ্যে তিনিই সর্বপ্রথম কলানৈপুণ্যের সৃষ্টি করেন। স্কুলপাঠ্যপুস্তক, অনুবাদ গ্রন্থ, নীতিমূলক গল্প ইত্যাদি রচনা করিয়া তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। 'অদ্ভুত আতিথেয়তা' গল্পে তিনি 'অতিথি ধর্মের' নীতির কথা বলিয়াছেন।]

একদা আরব জাতির সহিত মূরদিগের সংগ্রাম হইয়াছিল। আরবসেনা বহুদূর পর্যন্ত এক মূর সেনাপতির অনুসরণ করে। তিনি অশ্বারোহণে ছিলেন, প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। আরবেরা তাঁহার অনুসরণে বিরত হইলে, তিনি স্বপক্ষীয় শিবিরের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দিক্‌ভ্রম জন্মিয়াছিল, এজন্য দিক্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া তিনি বিপক্ষের শিবিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে তিনি এরূপ ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে, আর কোনও ক্রমেই অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতে পারেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি এক আরব সেনাপতির পটমণ্ডপদ্বারে উপস্থিত হইয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। আতিথেয়তা বিষয়ে পৃথিবীতে কোনও জাতিই আরবদিগের তুল্য নহে। কেহ অতিথিভাবে আরবদিগের আশ্রয়ে উপস্থিত হইলে তাঁহারা সাধ্যানুসারে তাহার পরিচর্যা করেন। সে ব্যক্তি

শত্রু হইলেও অণুমাত্র অনাদর, বিদ্বেষ প্রদর্শন বা বিপক্ষতাচরণ করেন না।

আরব সেনাপতি তৎক্ষণাৎ প্রার্থিত আশ্রয় প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত অভিভূত দেখিয়া আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিলেন।

মূর সেনাপতি ক্ষুন্নিবৃত্তি, পিপাসাশান্তি ও ক্লান্তি পরিহার করিয়া উপবিষ্ট হইলে বন্ধুভাবে উভয় সেনাপতির কথোপকথন হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পর স্বীয় পূর্বপুরুষদিগের সাহস, পরাক্রম, সংগ্রামকৌশল প্রভৃতির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সহসা আরব সেনাপতির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান ও তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং কিঞ্চিৎ পরেই মূর সেনাপতিকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমার অতিশয় অসুখবোধ হইয়াছে, এজন্য আমি উপস্থিত থাকিয়া আপনকার পরিচর্যা করিতে পারিলাম না ; আহার সামগ্রী ও শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, আপনি আহার করিয়া শয়ন করুন। আর, আমি দেখিলাম, আপনকার অশ্ব যেরূপ ক্লান্ত ও হতবীর্য হইয়াছে তাহাতে আপনি কোনও ক্রমেই নিরুদ্বেগে ও নিরুপদ্রবে স্বীয় শিবিরে পঁহুছিতে পারিবেন না। অতি প্রত্যূষে এক দ্রুতগামী তেজস্বী অশ্ব, সজ্জিত হইয়া পটমণ্ডপের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিবেক ; আমিও সেই সময়ে আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং যাহাতে আপনি সত্বর প্রস্থান করিতে পারেন তদ্বিষয়ে যথোপযুক্ত আনুকূল্য করিব।

কি কারণে আরব সেনাপতি এরূপ বলিয়া পাঠাইলেন, তাহার মর্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া, মূর সেনাপতি, আহার করিয়া, সন্দিহান চিত্তে শয়ন করিলেন। রজনী শেষে আরব সেনাপতির লোক তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করাইল এবং কহিল, আপনকার প্রস্থানের সময় উপস্থিত, গাত্রোত্থান ও মুখপ্রক্ষালনাদি করুন, আহার প্রস্তুত। মূর সেনাপতি শয্যা পরিত্যাগপূর্বক, মুখপ্রক্ষালনাদি সমাপন করিয়া আহারস্থানে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সেখানে আরব সেনাপতিকে দেখিতে পাইলেন না। পরে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি সজ্জিত অশ্বের মুখরশ্মি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন।

আরব সেনাপতি দর্শনমাত্র, সাদর সম্ভাষণ করিয়া মূর সেনাপতিকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন এবং কহিলেন, আপনি সত্বর প্রস্থান করুন। এই বিপক্ষ শিবির মধ্যে, আমা অপেক্ষা আপনকার ঘোরতর বিপক্ষ আর নাই। গত রজনীতে, যৎকালে আমরা উভয়ে একাসনে আসীন হইয়া অশেষবিধ

কথোপকথন করিতেছিলাম, আপনি স্বীয় ও স্বীয় পূর্বপুরুষদিগের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে করিতে আমার পিতার প্রাণহন্তার নির্দেশ করিয়াছিলেন। আমি শ্রবণমাত্র বৈরসাধন বাসনার বশবর্তী হইয়া বারংবার এই শপথ ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সূর্যোদয় হইলেই প্রাণপণে পিতৃহন্তার প্রাণবধ সাধনে প্রবৃত্ত হইব। এখন পর্যন্ত সূর্যের উদয় হয় নাই, কিন্তু উদয়েরও অধিক বিলম্ব নাই। আপনি সত্বর প্রস্থান করুন। আমাদের জাতীয় ধর্ম এই, প্রাণান্ত ও সর্বস্বান্ত হইলেও অতিথির অনিষ্ট চিন্তা করি না। কিন্তু আমার পটমণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলেই আপনকার অতিথিভাব অপগত হইবেক এবং সেই মুহূর্ত অবধি, আপনি স্থির জানিবেন, আমি আপনকার প্রাণসংহারের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন ও অশেষ প্রকারে চেষ্টা পাইব। এই যে অপর অশ্ব সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে দেখিতেছেন, সূর্যোদয় হইবামাত্র, আমি উহাতে আরোহণ করিয়া বিপক্ষভাবে আপনকার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু আমি আপনাকে যে অশ্ব দিয়াছি, উহা আমার অশ্ব অপেক্ষা কোনও অংশেই হীন নহে ; যদি উহা দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের উভয়ের প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা।

এই বলিয়া, আরব সেনাপতি সাদর সম্ভাষণ ও করমর্দনপূর্বক, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। আরব সেনাপতিও, সূর্যোদয় দর্শনমাত্র অশ্বে আরোহণ করিয়া তদীয় অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মূর সেনাপতি কতিপয় মুহূর্ত পূর্বে প্রস্থান করিয়াছিলেন এবং তদীয় অশ্বও বিলক্ষণ সবল ও দ্রুতগামী। এজন্য, তিনি নির্বিঘ্নে স্বপক্ষীয় শিবিরসন্নিবেশ স্থানে উপস্থিত হইলেন। আরব সেনাপতি, সবিশেষ যত্ন ও নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে, তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে স্বপক্ষশিবিরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, এবং অতঃপর আর বৈরসাধন সংকল্প সফল হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া স্বীয় শিবিরে প্রতিগমন করিলেন।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১। 'অদ্ভূত আতিথেয়তা' —কথাটির অর্থ পরিস্ফুট কর, ও এইরূপ আতিথেয়তা কিভাবে আরব সেনাপতির ব্যবহারে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বুঝাইয়া বল।

২। মূর সেনাপতি কি অবস্থায় আরব সেনাপতির শিবিরে উপস্থিত হইলেন? আরব সেনাপতি তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলেন?

শত্রু হইলেও অণুমাত্র অনাদর, বিদ্বেষ প্রদর্শন বা বিপক্ষতাচরণ করেন না।

আরব সেনাপতি তৎক্ষণাৎ প্রার্থিত আশ্রয় প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত অভিভূত দেখিয়া আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিলেন।

মূর সেনাপতি ক্ষুন্নিবৃত্তি, পিপাসাশান্তি ও ক্লান্তি পরিহার করিয়া উপবিষ্ট হইলে বন্ধুভাবে উভয় সেনাপতির কথোপকথন হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পর স্বীয় পূর্বপুরুষদিগের সাহস, পরাক্রম, সংগ্রামকৌশল প্রভৃতির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সহসা আরব সেনাপতির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান ও তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং কিঞ্চিৎ পরেই মূর সেনাপতিকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমার অতিশয় অসুখবোধ হইয়াছে, এজন্য আমি উপস্থিত থাকিয়া আপনকার পরিচর্যা করিতে পারিলাম না ; আহার সামগ্রী ও শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, আপনি আহার করিয়া শয়ন করুন। আর, আমি দেখিলাম, আপনকার অশ্ব যেরূপ ক্লান্ত ও হতবীর্য হইয়াছে তাহাতে আপনি কোনও ক্রমেই নিরুদ্বেগে ও নিরুপদ্রবে স্বীয় শিবিরে পঁহুছিতে পারিবেন না। অতি প্রত্যুষে এক দ্রুতগামী তেজস্বী অশ্ব, সজ্জিত হইয়া পটমণ্ডপের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিবেক ; আমিও সেই সময়ে আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং যাহাতে আপনি সত্বর প্রস্থান করিতে পারেন তদ্বিষয়ে যথোপযুক্ত আনুকূল্য করিব।

কি কারণে আরব সেনাপতি এরূপ বলিয়া পাঠাইলেন, তাহার মর্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া, মূর সেনাপতি, আহার করিয়া, সন্দিহান চিত্তে শয়ন করিলেন। রজনী শেষে আরব সেনাপতির লোক তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করাইল এবং কহিল, আপনকার প্রস্থানের সময় উপস্থিত, গাত্রোত্থান ও মুখপ্রক্ষালনাদি করুন, আহার প্রস্তুত। মূর সেনাপতি শয্যা পরিত্যাগপূর্বক, মুখপ্রক্ষালনাদি সমাপন করিয়া আহারস্থানে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সেখানে আরব সেনাপতিকে দেখিতে পাইলেন না। পরে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি সজ্জিত অশ্বের মুখরশ্মি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন।

আরব সেনাপতি দর্শনমাত্র, সাদর সম্ভাষণ করিয়া মূর সেনাপতিকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন এবং কহিলেন, আপনি সত্বর প্রস্থান করুন। এই বিপক্ষ শিবির মধ্যে, আমা অপেক্ষা আপনকার ঘোরতর বিপক্ষ আর নাই। গত রজনীতে, যৎকালে আমরা উভয়ে একাসনে আসীন হইয়া অশেষবিধ

কথোপকথন করিতেছিলাম, আপনি স্বীয় ও স্বীয় পূর্বপুরুষদিগের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে করিতে আমার পিতার প্রাণহন্তার নির্দেশ করিয়াছিলেন। আমি শ্রবণমাত্র বৈরসাধন বাসনার বশবর্তী হইয়া বারংবার এই শপথ ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সূর্যোদয় হইলেই প্রাণপণে পিতৃহন্তার প্রাণবধ সাধনে প্রবৃত্ত হইব। এখন পর্যন্ত সূর্যের উদয় হয় নাই, কিন্তু উদয়েরও অধিক বিলম্ব নাই। আপনি সত্বর প্রস্থান করুন। আমাদের জাতীয় ধর্ম এই, প্রাণান্ত ও সর্ব-স্বান্ত হইলেও অতিথির অনিষ্ট চিন্তা করি না। কিন্তু আমার পটমণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলেই আপনকার অতিথিভাব অপগত হইবেক এবং সেই মুহূর্ত অবধি, আপনি স্থির জানিবেন, আমি আপনকার প্রাণসংহারের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন ও অশেষ প্রকারে চেষ্টা পাইব। এই যে অপর অশ্ব সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে দেখিতেছেন, সূর্যোদয় হইবামাত্র, আমি উহাতে আরোহণ করিয়া বিপক্ষভাবে আপনকার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু আমি আপনাকে যে অশ্ব দিয়াছি, উহা আমার অশ্ব অপেক্ষা কোনও অংশেই হীন নহে ; যদি উহা দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের উভয়ের প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা।

এই বলিয়া, আরব সেনাপতি সাদর সম্ভাষণ ও করমর্দনপূর্বক, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। আরব সেনাপতিও, সূর্যোদয় দর্শনমাত্র অশ্বে আরোহণ করিয়া তদীয় অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মূর সেনাপতি কতিপয় মুহূর্ত পূর্বে প্রস্থান করিয়াছিলেন এবং তদীয় অশ্বও বিলক্ষণ সবল ও দ্রুতগামী। এজন্য, তিনি নির্বিঘ্নে স্বপক্ষীয় শিবিরসন্নিবেশ স্থানে উপস্থিত হইলেন। আরব সেনাপতি, সবিশেষ যত্ন ও নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে, তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে স্বপক্ষশিবিরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, এবং অতঃপর আর বৈরসাধন সংকল্প সফল হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া স্বীয় শিবিরে প্রতিগমন করিলেন।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১। 'অদ্ভুত আতিথেয়তা' —কথাটির অর্থ পরিস্ফুট কর, ও এইরূপ আতিথেয়তা কিভাবে আরব সেনাপতির ব্যবহারে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বুঝাইয়া বল।

২। মূর সেনাপতি কি অবস্থায় আরব সেনাপতির শিবিরে উপস্থিত হইলেন? আরব সেনাপতি তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলেন?

৩। মুর সেনাপতি ও আরব সেনাপতির কথোপকথনের সারাংশ লিখ। আরব সেনাপতির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল কেন? তখন তিনি কি করিলেন ও কি বলিলেন? মুর সেনাপতি ইহার মর্মগ্রহণ করিতে পারিলেন না কেন?

৪। "এই বিপক্ষ শিবির মধ্যে, আমা অপেক্ষা আপনকার ঘোরতর বিপক্ষ আর নাই।" —এই কথা কে, কাহাকে ও কেন বলিয়াছিলেন? এই প্রসঙ্গে বক্তার চরিত্র ও ব্যবহার কিরূপ মনে হয়?

৫। আরব সেনাপতি কেন মুর সেনাপতির পশ্চাদ্ধাবন করিলেন?

৬। এই গল্প পড়িয়া কি শিক্ষা লাভ করা যায়? অনুরূপ শিক্ষার একটি ভারতীয় গল্প বলিতে চেষ্টা কর।

৭। অর্থ লিখ :— পটমণ্ডপ, স্বপক্ষীয়, অণুমাত্র, ক্ষুৎপিপাসা, ক্ষুন্নিবৃত্তি, গাত্রোত্থান, হতবীর্য, সম্ভাষণ, অশেষবিধ, বৈরসাধন, প্রতিগমন, বিলক্ষণ, তদীয়।

৮। বাক্য রচনা কর :— তৎক্ষণাৎ, প্রার্থিত, আবির্ভূত, বিবর্ণ, হতবীর্য, নিরুদ্বেগে, আনুকূল্য, অশেষবিধ, প্রবৃত্ত, অভিভূত।

৯। বানান শিখ :— শত্রু, তৎক্ষণাৎ, অতঃপর, প্রত্যূষে, আনুকূল্য, মর্মগ্রহণ, বিবর্ণ, ধারণ, বিলক্ষণ, অনুসরণ, প্রবৃত্ত, শ্রবণ, আরোহণ, সম্ভাষণ, সর্বস্বান্ত, মুহূর্ত, অশেষ, প্রাণপণে, দ্রুতগামী, অদ্ভুত।

১০। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :— অশ্বারোহণ, সাধ্যানুসারে, বিপক্ষতাচরণ, ক্ষুৎপিপাসা, ক্ষুন্নিবৃত্তি, পরস্পর, গাত্রোত্থান, প্রত্যূষে, যথোপযুক্ত, তদ্বিষয়ে, মুখপ্রক্ষালনাদি, সম্ভাষণ, একাসনে, বারংবার, সর্বস্বান্ত, সূর্যোদয়, সম্ভাবনা, সন্নিবেশ।

১১। টীকা লিখ :— আপনকার—আপনার। চেষ্টা পাইব—চেষ্টা করিব। থাকিবেক—থাকিবে। আনুকূল্য করিব—সহযোগিতা করিব। যৎকালে—যে সময়ে। হইবেক—হইবে।



—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে ২৪ পরগনা জেলার কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'দেবী-চৌধুরাণী', 'আনন্দমঠ' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। আলোচ্য 'সন্তানের ব্রত' রচনাটি তাঁহার 'আনন্দমঠ' উপন্যাস হইতে লওয়া হইয়াছে। স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক 'বন্দেমাতরম্' গানখানি 'আনন্দমঠে' প্রকাশিত হয়। এই গানে দেশকে জননীরূপে বন্দনা করা হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 'বন্দেমাতরম্' স্বাদেশিকের মন্ত্ররূপে দেশের জন-সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে। 'সন্তানের ব্রত' স্বদেশপ্রেমিকের ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপনের মূল মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্'।]

মহেন্দ্র শকট হইতে নামিয়া একজন সিপাহীর প্রহরণ কাড়িয়া লইয়া যুদ্ধে যোগ দিবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু এমন সময়ে তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল যে, ইহারা দস্যু; ধনাপহরণ জন্যই সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি যুদ্ধস্থান হইতে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন। কেন না, দস্যুদের সহায়তা করিলে তাহাদিগের দুরাচারের ভাগী হইতে হইবে। তখন তিনি তরবারি ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ভবানন্দ আসিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনি কে?"

ভবানন্দ বলিল, "তোমার তাতে প্রয়োজন কি?"

মহেন্দ্র। আমার কিছু প্রয়োজন আছে। আজ আমি আপনার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

ভবা। সে বোধ যে তোমার আছে, এমন বুঝিলাম না—অস্ত্রহাতে করিয়া তফাৎ রহিলে—জমিদারের ছেলে, দুধ-ঘির শ্রাদ্ধ করিতে মজবুত—কাজের বেলা হনুমান্!

ভবানন্দের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে মহেন্দ্র ঘৃণার সহিত বলিলেন, "এ যে কুকাজ—ডাকাতি।" ভবানন্দ বলিল, "হউক ডাকাতি, আমরা তোমার কিছু উপকার করিয়াছি। আরও কিছু উপকার করিবার ইচ্ছা রাখি।"

মহেন্দ্র। তোমরা আমার কিছু উপকার করিয়াছ বটে, কিন্তু আর কি উপকার করিবে? আর ডাকাতের কাছে এত উপকৃত হওয়ার চেয়ে আমার অনুপকৃত থাকাই ভাল।

ভবা। উপকার গ্রহণ কর না কর, তোমার ইচ্ছা। যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে আইস। তোমার স্ত্রীকন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব।

মহেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "সে কি?"

ভবানন্দ সে কথার উত্তর না করিয়া চলিল। অগত্যা মহেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে চলিল—মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এরা কি রকম দস্যু?

সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দুইজনে নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিল। মহেন্দ্র নীরব, শোককাতর, গর্বিত, কিছু কৌতূহলী।

ভবানন্দ সহসা ভিন্নমূর্তি ধারণ করিলেন। সে স্থিরমূর্তি, ধীরপ্রকৃতি সন্ন্যাসী আর নাই; সেই রণনিপুণ বীরমূর্তি আর নাই। ভবানন্দ হাস্যমুখ, বাঙ্ময়, প্রিয়সম্ভাষী হইলেন। কথাবার্তার জন্য বড় ব্যগ্র। ভবানন্দ কথোপকথনের অনেক উদ্যম করিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিল না। তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন—

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না—সুজলা,

সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা মাতা কে,—জিজ্ঞাসা করিল, "মাতা কে?"

উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গাইতে লাগিলেন,—

"শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্—
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র বলিল, "এত ত দেশ, এ ত মা নয়।"

ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা মানি না—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা—" তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "তবে আবার গাও।"

ভবানন্দ আবার গায়িলেন।

মহেন্দ্র দেখিল দস্যু গায়িতে গায়িতে কাঁদিতে লাগিল। মহেন্দ্র তখন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমরা কারা?" ভবানন্দ বলিল, "আমরা সন্তান।"

মহেন্দ্র। সন্তান কি? কার সন্তান?

ভবা। মায়ের সন্তান।

মহেন্দ্র। ভাল—সন্তানে কি চুরি-ডাকাতি করিয়া মায়ের পূজা করে? সে কেমন মাতৃভক্তি?

ভবা। আমরা চুরি-ডাকাতি করি না।

মহে। এই ত গাড়ি লুঠিলে।

ভবা। সে কি চুরিডাকাতি? কার টাকা লুঠিলাম?

মহে। কেন? রাজার?

ভবা। রাজার? এই যে টাকাগুলি সে লইবে, এ টাকায় তার কি অধিকার?

মহে। রাজার রাজভোগ।

ভবা। যে রাজা রাজ্য পালন করে না, সে আবার রাজা কি?

মহে। তোমরা সিপাহীর তোপের মুখে কোন্ দিন উড়িয়া যাইবে দেখিতেছি?

ভবা। অনেক শালা সিপাহী দেখিয়াছি—আজিও দেখিলাম।

মহে। ভাল করে দেখ নি, একদিন দেখিবে।

ভবা। না হয় দেখলাম, একবার বই ত আর দু'বার মরব না।

মহে। তা ইচ্ছা করিয়া মরিয়া কাজ কি?

ভবা। 'মহেন্দ্র সিংহ! তোমাকে মানুষের মত মানুষ বলিয়া আমার কিছু বোধ ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম, সবাই যা তুমিও তা। কেবল দুধ-ঘির যম। দেখ, সাপ মাটিতে বুক দিয়া হাঁটে, তাহা অপেক্ষা নীচ জীব আমি তো আর দেখি না; সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া উঠে। তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য নষ্ট হয় না?

মহে। তোমাদের এসব গুণ আছে?

ভবা। না। কিন্তু গুণ গাছ থেকে পড়ে না। অভ্যাস করিতে হয়।

মহে। তোমরা কি অভ্যাস কর?

ভবা। দেখিতেছ না আমরা সন্ন্যাসী। আমাদের সন্ন্যাস এই অভ্যাসের জন্য। কার্য উদ্ধার হইলে—অভ্যাস সম্পূর্ণ হইলে আবার গৃহী হইব। আমাদেরও স্ত্রী কন্যা আছে।

মহে। তোমরা সে সকল ত্যাগ করিয়াছ—মায়া কাটাইতে পারিয়াছ?

ভবা। সন্তানকে মিথ্যা কথা কহিতে নাই। তোমার কাছে মিথ্যা বড়াই করিব না। মায়া কাটাইতে পারে কে? যে বলে আমি মায়া কাটাইয়াছি, হয় তার মায়া কখন ছিল না বা সে মিছে বড়াই করে। আমরা মায়া কাটাই না—আমরা ব্রত রক্ষা করি।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১। 'ভবানন্দ' কে? 'মহেন্দ্র'ই বা কে? উভয়ের সাক্ষাৎ কিভাবে হইল?

২। ভবানন্দ ও 'মহেন্দ্রর কথোপকথনের সারাংশ লিখ।

৩। "জমিদারের ছেলে, দুধ-ঘির শ্রাদ্ধ করিতে মজবুত—কাজের বেলা হনুমান্।" —এই কথা কে, কাহাকে, কখন বলিয়াছিল? এই কথার তাৎপর্য কি?

৪। "মহেন্দ্র নীরব, শোককাতর, গর্বিত, কিছু কৌতূহলী।" —মহেন্দ্র কে? তিনি নীরব, শোককাতর, গর্বিত ও কৌতূহলী কেন?

৫। "তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন।" —ভবানন্দ কে? তিনি নিরুপায় হইলেন কেন? তিনি কোন্ গীত আরম্ভ করিলেন? এই সময়ে এই গীতের উদ্দেশ্য কি? এই গীতের তাৎপর্য কি?

৬। "সন্তান কি চুরি-ডাকাতি করিয়া মায়ের পূজা করে?" —এই কথা কে, কাহাকে বলিয়াছিলেন? 'সন্তান' কাহারা? তাহারা সত্যিই কি চুরি-ডাকাতি করে? তাহারা কোন্ মায়ের পূজা করে, ও কেন করে?

৭। 'সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া উঠে।' —এই কথা কে, কাহাকে, ও কি উদ্দেশ্যে বলিয়াছিল?

৮। 'আমাদের সন্ন্যাস এই অভ্যাসের জন্য।' —কাহাদের কি রকম সন্ন্যাস, কোন্ অভ্যাসের জন্য? এই অভ্যাস আয়ত্ত করিবার উদ্দেশ্য কি?

৯। অর্থ লিখ ঃ— শকট, প্রহরণ, দুরাচার, প্রান্তর, কৌতূহলী, স্থিরমূর্তি, ধীরপ্রকৃতি, প্রিয়সম্ভাষী, সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা, সবিস্ময়ে, মানুষের মত মানুষ, ব্রত, মায়া, গৃহী।

১০। বাক্য রচনা কর ঃ— সহায়তা, উপকৃত, অগত্যা, গর্বিত, কৌতূহলী, সবিস্ময়ে, গরীয়সী, সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, রণনিপুণ, হাস্যমুখ, ধীরপ্রকৃতি, নিরুপায়, রাজভোগ।

১১। বানান শিখ ঃ— সন্ন্যাসী, কৌতূহলী, রণনিপুণ, বীরমূর্তি, ব্যগ্র, শস্য-শ্যামলা, জন্মভূমি, ধৈর্য, গুণ, সম্পূর্ণ, প্রহরণ, আক্রমণ।

১২। সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ— মহেন্দ্র, ভবানন্দ, সন্ন্যাসী, উদ্ধার, নিরুপায়, সম্পূর্ণ, ধনাপহরণ।



বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্বসূরীদের প্রতি অনেক প্রবন্ধেই শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। চরিত্র চিত্রণে, বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ যে সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন তাহা 'বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন' প্রবন্ধেও লক্ষ্য করা যায়। একগুঁয়ে, বলিষ্ঠ, কর্মঠ স্বভাবের বিদ্যাসাগর কিভাবে দারিদ্র্য ও অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াও 'দয়ার সাগর' হইলেন তাহা এই প্রবন্ধে সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে।]

বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথমভাগে গোপাল-নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ; তাহাকে বাপ-মায়ে যাহা বলেন, সে তাহাই করে : কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন তখন গোপাল অপেক্ষা কোন কোন অংশে রাখালের সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক, পিতা যাহা বলিতেন তিনি ঠিক তাঁহার উলটা করিয়া বসিতেন। শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছেন "পিতা তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যেদিন সাদা বস্ত্র না থাকিত সেদিন বলিতেন, ভালো কাপড় পরিয়া যাইতে হইবে ; তিনি হঠাৎ বলিতেন, না, আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যেদিন বলিতেন, আজ স্নান করিতে হইবে ; শ্রবণমাত্র দাদা বলিতেন যে, আজ স্নান করিব না। পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া ট্যাকশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা চড়-চাপড় মারিয়া জোর করিয়া স্নান করাইতেন।"

পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সের সময়ে যখন গ্রামের পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন তখন প্রতিবেশী মথুর মণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয়া দিবার জন্য যে প্রকার

সভ্যবিগর্হিত উপদ্রব তিনি করিতেন, বর্ণপরিচয়ের সর্বজন নিন্দিত রাখাল বেচারাও বোধ করি এমন কখনও করে নাই।

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালীজাতির শীর্ণ চরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু একটা বিষয়ে রাখালের সহিত তাহার জীবনচরিত-লেখকের সাদৃশ্য ছিল না। "রাখাল পড়িতে যাইবার সময় পথে খেলা করে, মিছামিছি দেরি করিয়া সকলের শেষে পাঠশালায় যায়।" কিন্তু পড়াশুনায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। যে প্রবল জিদের সহিত তিনি পিতার আদেশ ও নিষেধের বিপরীত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই দুর্দম জিদের সহিত তিনি পড়িতে যাইতেন সেও তাঁহার প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে নিজের জিদরক্ষা। ক্ষুদ্র একগুঁয়ে ছেলেটি মাথায় এক মস্ত ছাতা তুলিয়া তাঁহাদের বড়োবাজারের বাসা হইতে পটলডাঙায় সংস্কৃত কলেজে যাত্রা করিতেন। লোকে মনে করিত, একটা ছাতা চলিয়া যাইতেছে। এই দুর্জয় বালকের শরীরটি খর্ব শীর্ণ, মাথাটা প্রকাণ্ড—স্কুলের ছেলেরা সেইজন্য তাঁহাকে 'যশুরে কই' ও তাহার অপভ্রংশে 'কসুরে জই' বলিয়া খ্যাপাইত। তিনি তখন তোৎলা ছিলেন, রাগিলে কথা কহিতে পারিতেন না।

এই বালক রাত্রি দশটার সময় শুইতে যাইতেন। পিতাকে বলিয়া যাইতেন রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহাকে জাগাইয়া দিতে। পিতা আর্মানি-গির্জার ঘড়িতে বারোটা বাজিলে ঈশ্বরচন্দ্রকে জাগাইতেন, বালক অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া পড়া করিতেন। ইহাও একগুঁয়ে ছেলের শরীরের প্রতি জিদ। শরীরও তাহার প্রতিশোধ তুলিতে ছাড়িত না। মাঝে মাঝে কঠিন সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল, কিন্তু পীড়ার শাসনে তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই।

ইহার উপরে গৃহকর্মও অনেক ছিল। বাসায় তাঁহার পিতা ও মধ্যম ভ্রাতা ছিলেন। দাসদাসী ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র দুই বেলা সকলের রন্ধনাদি কার্য করিতেন। সহোদর শম্ভুচন্দ্র তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ঈশ্বরচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আবৃত্তি করিয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া কাশীনাথবাবুর বাজারে বাটামাছ ও আলু-পটল-তরকারী ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাটনা বাটিয়া, উনান ধরাইয়া রন্ধন করিতেন। বাসায় তাঁহারা চারিজন খাইতেন। আহারের পর উচ্ছিষ্ট, মুখ ও বাসন ধৌত

করিয়া তবে পড়িতে যাইবার অবসর পাইতেন। পাক করিতে করিতে ও স্কুলে যাইবার সময় পথে চলিতে চলিতে পাঠানুশীলন করিতেন।

এই তো অবস্থা। এ দিকে ছুটির সময় যখন জল খাইতে যাইতেন তখন স্কুলের ছাত্র যাহারা উপস্থিত থাকিত, তাহাদিগকে মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। স্কুল হইতে মাসিক যে বৃত্তি পাইতেন ইহাতেই তাহা ব্যয় হইত। আবার দারোয়ানের নিকট হইতে ধার করিয়া ছাত্রদিগকে নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিতেন। পূজার ছুটির পর দেশে গিয়া "দেশস্থ যে-সকল লোকের দিনপাত হওয়া দুষ্কর দেখিতেন, তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। অন্যান্য লোকের পরিধেয় বস্ত্র না থাকিলে, গামছা পরিধান করিয়া নিজের বস্ত্রগুলি তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন।"

যে অবস্থায় মানুষ নিজের নিকটে নিজে প্রধান দয়ার পাত্র সে অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র অন্যকে দয়া করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে প্রথম হইতে ইহাই দেখা যায় যে, তাঁহার চরিত্র সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে। তাঁহার মতো অবস্থার ছাত্রের পক্ষে বিদ্যালাভ করা পরম দুঃসাধ্য, কিন্তু এ গ্রাম্যবালক শীর্ণ খর্ব দেহ এবং প্রকাণ্ড মাথা লইয়া আশ্চর্য অল্পকালের মধ্যে বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার মতো দরিদ্রাবস্থার লোকের পক্ষে দান করা, দয়া করা বড়ো কঠিন ; কিন্তু তিনি যখন যে অবস্থাতেই পড়িয়াছেন নিজের কোনো প্রকার অসচ্ছলতায় তাঁহাকে পরের উপকার হইতে বিরত করিতে পারে নাই, এবং অনেক মহৈশ্বর্যশালী রাজা-রায়বাহাদুর প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধি লাভ করিতে পারে নাই, এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান 'দয়ার সাগর' নামে বঙ্গদেশে চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১। 'বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের জিদ ও একগুঁয়েমির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে বল।

২। 'গোপাল' ও 'রাখাল' কাহারা? 'গোপাল অপেক্ষা রাখালের সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত'—এই কথার তাৎপর্য কি?

৩। "পিতা তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন"—কাহার পিতা, কাহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন? এই স্বভাব বুঝিয়া চলার কারণ কি? এইরূপ স্বভাব বুঝিয়া চলার দুই-একটি দৃষ্টান্ত দাও।

৪। ব্যাখ্যা লিখ :—

(ক) 'এই ক্ষীণতেজ দেশে...............অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে।'

(খ) 'অনেক মহৈশ্বর্যশালী...............বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।'

৫। 'কিন্তু একটা বিষয়ে রাখালের সহিত তাহার জীবনচরিত লেখকের সাদৃশ্য ছিল না।' —রাখাল কে? তাহার জীবনচরিত লেখক কে? রাখালের সহিত তাহার কোন্ বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল, আর কোন্ বিষয়েই বা সাদৃশ্য ছিল না?

৬। বিদ্যালয়ের পথে বিদ্যাসাগরের চলার ছবিটি সংক্ষেপে চিত্রিত কর।

৭। ছাত্রজীবনে বিদ্যাসাগরের দৈনন্দিন জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত কর্মসূচী প্রণয়ন কর।

৮। ছাত্রজীবনই যে বিদ্যাসাগরের 'দয়ার সাগর' হইবার ভূমিকা পর্ব তাহা কিভাবে বুঝা যায়?

৯। টীকা লিখ :— বর্ণপরিচয়, ট্যাকশালের ঘাট, সর্বজননিন্দিত রাখাল বেচারা, যশুরে কই, আর্মানিগির্জা, কাশীনাথবাবুর বাজার, দয়ার সাগর।

১০। অর্থ লিখ :— প্রতিকূল, যথাসাধ্য, শীর্ণ, খর্ব, পরিধেয়, বিরত, দিনপাত, পরাভূত, শৈথিল্য, সাদৃশ্য, কিয়ৎক্ষণ, ক্ষীণতেজ, নিরীহ, সভ্যবিগর্হিত, সর্বজননিন্দিত, প্রাদুর্ভাব।

১১। বানান শিখ :— বর্ণপরিচয়, সাদৃশ্য, শ্রবণ, চড়চাপড়, প্রতিবেশী, নিরীহ, শীর্ণ, ক্ষীণতেজ, কিয়ৎক্ষণ, শৈথিল্য, পরাভূত, পীড়া, প্রত্যূষে, দুষ্কর, ক্ষান্ত, দেশস্থ, প্রতিকূল, অসচ্ছলতা, মহৈশ্বর্যশালী।

১২। বাক্য রচনা কর :— অধিকতর, সাদৃশ্য, বিরত, দুষ্কর, প্রতিকূল, ক্ষীণতেজ, শৈথিল্য, শীর্ণ, চড়চাপড়, পরিধেয়, সভ্যবিগর্হিত, নিরীহ, প্রাদুর্ভাব, পরাভূত, পাঠানুশীলন, দিনপাত, যথাসাধ্য, উচ্ছিষ্ট, খর্ব, মহৈশ্বর্যশালী, বেচারা।

১৩। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :— মহৈশ্বর্যশালী, প্রত্যূষ, ক্ষান্ত, দুষ্কর, প্রাদুর্ভাব, পাঠানুশীলন, উচ্ছিষ্ট।

১৪। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :— সুবোধ, সাদৃশ্য, উল্টা, সাদা, সর্বজননিন্দিত, ক্ষীণতেজ, দুর্দান্ত, শৈথিল্য, নিষেধ, প্রতিকূল, শীর্ণ, খর্ব, বিরত, দরিদ্র।

১৫। 'তোমার ছাত্রজীবন' বিষয়ে সংক্ষেপে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।



সেকেন্দার শাহের পরাভব

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[পরিচিতি। বিখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক। তিনি ১৮৬২ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯১৩ খৃঃ অব্দে পরলোক-গমন করেন। তিনি অনেক স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক নাটক রচনা করেন। বর্তমান নাট্যাংশটি 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের প্রথম দৃশ্যের আরম্ভ]

স্থান—সিন্ধুনদ-তট ; দূরে গ্রীক জাহাজশ্রেণী। কাল—সন্ধ্যা। নদীতটে শিবির সম্মুখে সেকেন্দার ও সেলুকস অস্তগামী সূর্যের দিকে চাহিয়াছিলেন।

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস্! কি বিচিত্র এই দেশ। দিনে প্রচণ্ড সূর্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়; আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। প্রাবৃটে ঘন-কৃষ্ণ মেঘরাশি গুরুগম্ভীরগর্জনে প্রকাণ্ড দৈত্য-সৈন্যের মত আকাশ ছেয়ে আসে, আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। এর অভ্রভেদী ধবল-তুষার-মৌলি নীল হিমাদ্রি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদনদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম বেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি বিরাট স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা কচ্ছে।

সেলুকস। সত্য সম্রাট্।

সেকেন্দার। কোথাও দেখি তালীবন গর্বভরে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে; কোথাও বিরাট বট স্নেহচ্ছায়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে; কোথাও মদমত্তমাতঙ্গ জঙ্গম-পর্বতবৎ মন্থর গমনে চলেছে; কোথাও মহাভুজঙ্গম অলস হিংসার মত বক্র রেখায় প'ড়ে আছে; কোথাও বা মহাশৃঙ্গ কুরঙ্গম মুগ্ধ বিস্ময়ের মত নির্জন বনমধ্যে শূন্য-প্রেক্ষণে চেয়ে আছে। আর সবার উপরে এক সৌম্য, গৌর, দীর্ঘকান্তি জাতি এই দেশ শাসন কচ্ছে। তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস। এই শৌর্য পরাজয় ক'রে আনন্দ আছে। পুরুকে বন্দী ক'রে আনি যখন—সে কি বল্লে জানো?

সেলুকস। কি সম্রাট?

সেকেন্দার। আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম—আমার কাছে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর?—সে নির্ভীক নিষ্কম্পস্বরে উত্তর দিল—"রাজার প্রতি রাজার আচরণ!" চমকিত হ'লাম। ভাবলাম—এ একটা জাতি বটে! আমি তৎক্ষণাৎ তাকে তার রাজ্য প্রত্যর্পণ কর্লাম।

সেলুকস। সম্রাট্ মহানুভব!

সেকেন্দার। মহানুভব! তার পরে তার সঙ্গে অন্যরূপ ব্যবহার সম্ভব? মহৎ কিছু দেখলেই একটা উল্লাস আসে। আর, আমি এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে আসি নাই, আমি এসেছি সৌখীন দিগ্বিজয়ে। জগতে একটা কীর্তি রেখে যেতে চাই।

সেলুকস। তবে সে দিগ্বিজয় অসম্পূর্ণ রেখে যাচেছন কেন সম্রাট্?

সেকেন্দার। সে দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ কর্তে হলে নূতন গ্রীক সৈন্য চাই। —কি আশ্চর্য সেনাপতি! দূর মাসিডন থেকে রাজ্য জনপদ তৃণসম পদতলে দলিত ক'রে চলে এসেছি। ঝঞ্ঝার মত এসে মহাশত্রু-সৈন্য ধূমরাশির মত উড়িয়ে দিয়েছি। অর্ধেক এশিয়া মাসিডনের বিজয়বাহিনীর বীরপদভরে কম্পিত হ'য়েছে। নিয়তির মত দুর্বার, হত্যার মত করাল, দুর্ভিক্ষের মত নিষ্ঠুর আমি অর্ধেক এশিয়ার বক্ষের উপর দিয়ে আমার রুধিরাক্ত বিজয়শকট অবাধে চালিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বাধা পেলেম প্রথম—সেই শতদ্রু-তীরে।

(চন্দ্রগুপ্তকে ধরিয়া আণ্টিগোনসের প্রবেশ)

সেকেন্দার। কি সংবাদ আণ্টিগোনস্? এ কে?

আণ্টিগোনস্। গুপ্তচর।

সেলুকস। সে কি!

সেকেন্দার। গুপ্তচর!

আণ্টিগোনাস্। আমি দেখলাম, এ এক শিবিরের পাশে ব'সে নির্জনে শুষ্ক তালপত্রে কি লিখ্‌ছিল। আমি দেখ্‌তে চাইলাম। পত্রখানি দেখাল। পড়তে পার্লাম না—তাই সম্রাটের কাছে নিয়ে এসেছি।

সেকেন্দার। কি লিখ্‌ছিলে যুবক? সত্য বল!

চন্দ্রগুপ্ত। সত্য বল্‌ব, রাজাধিরাজ! ভারতবাসী মিথ্যা কথা বল্‌তে এখনও শিখে নাই।

সেকেন্দার একবার সেলুকসের প্রতি চাহিলেন, পরে চন্দ্রগুপ্তকে কহিলেন —"উত্তম! বল কি লিখছিলে?"

চন্দ্রগুপ্ত। আমি সম্রাটের বাহিনী-চালনা, ব্যূহরচনা-প্রণালী, সামরিক নিয়ম, এই সব মাসাবধি কাল ধ'রে শিখছিলাম।—

সেকেন্দার। কার কাছে?

চন্দ্রগুপ্ত। এই সেনাপতির কাছে।

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস?

সেলুকস। সত্য।

সেকেন্দার। [চন্দ্রগুপ্তকে] তারপর?

চন্দ্রগুপ্ত। তারপর গ্রীকসৈন্য কাল এস্থান পরিত্যাগ ক'রে যাবে শুনে, আমি যা শিখেছি তা এই পত্রে লিখে নিচ্ছিলাম।

সেকেন্দার। কি অভিপ্রায়ে?

চন্দ্রগুপ্ত। সেকেন্দার শাহের সঙ্গে যুদ্ধ কর্বার জন্য নহে।

সেকেন্দার। তবে?

চন্দ্রগুপ্ত। তবে শুনুন সম্রাট্। আমি মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত। আমার পিতার নাম মহাপদ্ম। আমার বৈমাত্রেয় ভাই নন্দ সিংহাসন অধিকার করে আমায় নির্বাসিত করেছে। আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি।

সেকেন্দার। তারপর?

চন্দ্রগুপ্ত। তারপর শুন্‌লাম ম্যাসিডন-ভূপতির অদ্ভুত বিজয়বার্তা। অর্ধেক এশিয়া পদতলে দলিত ক'রে নদনদীগিরি দুর্বার বিক্রমে অতিক্রম

ক'রে শুন্‌লাম তিনি ভারতবর্ষে এসে আর্যকুলরবি পুরুকে পরাজিত করেছেন। হে সম্রাট! আমার ইচ্ছা হ'ল যে দেখে আসি—কি সে-পরাক্রম, যাঁর ভ্রূকুটি দেখে সমস্ত এশিয়া তার পদতলে লুটিয়ে পড়ে; কোথায় সে শক্তি লুক্কায়িত আছে, আর্যের মহাবীর্যও যার সংঘাতে বিচলিত হ'য়েছে। তাই এখানে এসে সেনাপতির কাছে শিক্ষা কচ্ছিলাম। আমার ইচ্ছা শুধু আমার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করা। এই মাত্র।

সেকেন্দার। তোমায় যদি বন্দী করি?

চন্দ্রগুপ্ত। কি অপরাধে সম্রাট?

সেকেন্দার। আমার শিবিরে তুমি শত্রুর গুপ্তচর হ'য়ে প্রবেশ করেছো, এই অপরাধে।

চন্দ্রগুপ্ত। এই অপরাধে? ভেবেছিলাম যে সেকেন্দার শাহ বীর, দেখ্‌ছি যে তিনি ভীরু। গৃহহীন নিরাশ্রয় হিন্দু রাজপুত্র ছাত্রহিসাবে তাঁর কাছে উপস্থিত, তাতেই তিনি ত্রস্ত। সেকেন্দার শাহ্‌ এত কাপুরুষ, তা ভাবি নাই।

সেকেন্দার। সেলুকস! বন্দী কর।

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট! আমায় বধ না ক'রে বন্দী কর্তে পার্বেন না।

(তরবারি বাহির করিলেন)

সেকেন্দার। [সোল্লাসে] চমৎকার!—যাও! বীর! তোমায় বন্দী কর্ব না। আমি পরীক্ষা করলাম মাত্র। নির্ভয়ে তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও। আর আমি এক ভবিষ্যদ্বাণী করি, মনে রেখো। তুমি হৃতরাজ্য উদ্ধার কর্বে। তুমি দুর্জয় দিগ্বিজয়ী হবে।—যাও বীর! মুক্ত তুমি।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১। সেকেন্দার শাহ কে ছিলেন? সেলুকাস কে ছিলেন? তিনি ভারতবর্ষের কোন্‌ কোন্‌ বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন?

২। পুরুরাজকে বন্দী করিয়া সেকেন্দার শাহ কি অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন?

৩। আণ্টিগোনস্‌ কে ছিলেন? তিনি কাহাকে সঙ্গে করিয়া সেকেন্দার শাহের নিকট আনিয়াছিলেন? তাহার পরিচয় কি?

৪। সেকেন্দার শাহ ও চন্দ্রগুপ্তের কথোপকথনের সারাংশ লিখ। এই প্রসঙ্গে উভয়ের চরিত্র সম্বন্ধে কি পরিচয় পাওয়া যায়?

৫। "তাহাদের মুখে শিশুর সারল্য.....................বক্ষে বাত্যার সাহস"—এই অংশের ব্যাখ্যা কর।

৬। নিম্নের উদ্ধৃতাংশে যে তুলনাবোধক বাক্যাংশগুলি আছে তাহা ব্যাখ্যা কর ও স্বাধীন বাক্যে প্রকাশ কর ঃ—

নিয়তির মত দুর্বার, হত্যার মত করাল, দুর্ভিক্ষের মত নিষ্ঠুর, মুখে শিশুর সারল্য।

৭। শব্দার্থ লিখ ঃ— শুভ্রচন্দ্রমা, উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জ, প্রাবৃট, অভ্রভেদী, ধবল-তুষার-মৌলি, ফেনিল উচ্ছ্বাস, উদ্দাম, মদমত্তমাতঙ্গ, জঙ্গম-পর্বতবৎ, মন্থর, মহাভুজঙ্গম, কুরঙ্গম, শূন্য-প্রেক্ষণে, নিষ্কম্পস্বরে, উল্লাস, দিগ্বিজয়, রুধিরাক্ত, বিজয় শকট, বিজয় বাহিনী, ব্যূহরচনা, দুর্বার, হৃতরাজ্য।

৮। বাক্য রচনা কর ঃ— ঝলমল, ঘন-কৃষ্ণ, উদ্দাম, অভ্রভেদী, গর্বভরে, সৌম্য, দীর্ঘকান্তি, সারল্য, নিষ্কম্পস্বরে, সৌখীন, তৃণসম, বৈমাত্রেয়, বিজয়বার্তা, দুর্বার, হৃতরাজ্য, নিরাশ্রয়, ত্রস্ত, দুর্জয়।

৯। বানান শিখ ঃ— স্নিগ্ধ, তামসী, অগণ্য, হিমাদ্রি, উচ্ছ্বাস, স্বেচ্ছাচার, দীর্ঘকান্তি, দীপ্তি, শৌর্য, নির্ভীক, আচরণ, তৎক্ষণাৎ, প্রত্যর্পণ, কীর্তি, সৌখীন, দিগ্বিজয়, ব্যূহ, প্রণালী, অদ্ভুত, ভ্রূকুটি, ভবিষ্যদ্বাণী।

১০। সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ—

উজ্জ্বল, উচ্ছ্বাস, উদ্দাম, স্বেচ্ছাচার, স্নেহচ্ছায়া, নির্জন, প্রত্যর্পণ, দিগ্বিজয়, আশ্চর্য, দুর্বার, নির্জন, পুনরুদ্ধার, নিরাশ্রয়, নির্ভয়, ভবিষ্যদ্বাণী, উদ্ধার।

সমদর্শী ইন্দ্রনাথ



—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার লেখা কয়েকখানি উপন্যাস—বিরাজবৌ, পল্লী সমাজ, গৃহদাহ, চরিত্রহীন, শেষপ্রশ্ন, পথের দাবী, শ্রীকান্ত। 'সমদর্শী ইন্দ্রনাথ' তাঁহার 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস হইতে গৃহীত। এখানে কিশোর বালক ইন্দ্রনাথের মানবপ্রেমের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।]

অনুকূল স্রোতে বোটের তাড়নায় ডিঙিখানা তর্ তর্ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ হইতে কেবল একটা দুর্গন্ধ মাঝে মাঝে হাওয়ার সঙ্গে নাকে আসিয়া লাগিতেছিল। যত অগ্রসর হইতেছিলাম ততই সেটা বাড়িতেছিল। এখন হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাসের সঙ্গে সেই দুর্গন্ধটা এমন বিকট হইয়া নাকে লাগিল যে, অসহ্য বোধ হইল। নাকে কাপড় চাপা দিয়া বলিলাম, নিশ্চয় কি পচেছে ইন্দ্র।

ইন্দ্র বলিল, মড়া। আজকাল ভয়ানক কলেরা হচ্ছে কিনা। সবাই ত পোড়াতে পারে না—মুখে একটুখানি আগুন ছুঁইয়ে ফেলে দিয়ে যায়। শিয়াল-কুকুরে খায় আর পচে। তারই অত গন্ধ।

কোন্‌খানে ফেলে দিয়ে যাই ভাই?

ঐ হোতা থেকে হেথা পর্যন্ত—সবটাই শ্মশান কিনা। যেখানে হোক ফেলে রেখে, ঐ বটতলার ঘাটে চান ক'রে বাড়ী চলে যায়,—আরে দূর! ভয়

কি রে! ওশিয়ালে-শিয়ালে লড়াই করচে।—আচ্ছা, আয়, আয়, আমার কাছে এসে বোস।

আমার গলা দিয়ে স্বর ফুটল না—কোনমতে হামাগুড়ি দিয়া তাহার কোলের কাছে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। সে ক্ষণকালের জন্য আমাকে একবার স্পর্শ করিয়া হাসিয়া কহিল, ভয় কি শ্রীকান্ত? কত রাত্তিরে একা আমি এই পথে যাই আসি—তিনবার রামনাম করলে কার সাধ্যি কাছে আসে?

গাছের ছায়ার মধ্যে আসিয়া পড়ায়, অদূরে সেই ঘাটটি চোখে পড়িল। যেখানে আমাদের অবতরণ করিতে হইবে, তাহার উপরে গাছপালা নাই, স্থানটি ম্লান জ্যোৎস্নালোকেও বেশ আলোকিত হইয়া আছে—দেখিয়া অত দুঃখেও একটু আরাম বোধ করিলাম। ঘাটের কাঁকরে ডিঙি ধাক্কা না খায়, এই জন্য ইন্দ্র পূর্বাহ্ণেই প্রস্তুত হইয়া মুখের কাছে সরিয়া আসিল এবং লাগিতে না লাগিতে লাফাইয়া পড়িয়াই একটা ভয়-জড়িত স্বরে 'ইস্' করিয়া উঠিল। আমিও তাহার পশ্চাতে ছিলাম। সুতরাং উভয়েই প্রায় একসময়েই সেই বস্তুটির উপর দৃষ্টিপাত করিলাম। তবে সে নীচে, আমি নৌকার উপরে।

অকাল-মৃত্যু বোধ করি আর কখনও তেমন করুণভাবে আমার চোখে পড়ে নাই। ইহা যে কত বড় হৃদয়ভেদী ব্যথার আধার, তাহা তেমন করিয়া বোধ করি দেখাই হয় না। গভীর নিশীথে চারিদিক নিবিড় স্তব্ধতায় পরিপূর্ণ। শুধু মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরালে শ্মশানচারী পক্ষীর শৃগালের কলহ-চীৎকার, কখন বা বৃক্ষোপবিষ্ট অর্ধসুপ্ত, বৃহৎকায় পক্ষ-তাড়ন-শব্দ, আর বহুদূরাগত তীব্র জলপ্রবাহের অবিশ্রাম হু-হু আর্তনাদ—ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয়েই নির্বাক্ নিস্তব্ধ হইয়া এই মহাকরুণ দৃশ্যটির পানে চাহিয়া রহিলাম।

একটি গৌরবর্ণ ছয়-সাত বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট বালক—তাহার সর্বাঙ্গ জলে ভাসিতেছে, শুধু মাথাটি ঘাটের উপর। শৃগালেরা বোধ করি জল হইতে তাহাকে এইমাত্র তুলিতেছিল, শুধু আমাদের আকস্মিক আগমনে নিকটে কোথাও গিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। খুব সম্ভব তিন-চারি ঘণ্টার অধিক তাহার মৃত্যু হয় নাই। ঠিক যেন বিসূচিকার নিদারুণ যাতনা ভোগ করিয়া সে বেচারা মা-গঙ্গার কোলের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মা অতি সন্তর্পণে তাহার সুকুমার নধর দেহটিকে এইমাত্র কোল হইতে বিছানায় শোয়াইয়া দিতেছিলেন। জলে-স্থলে বিন্যস্ত সেই ঘুমন্ত শিশু-দেহটির উপর সেদিন আমাদের চোখ পড়িয়াছিল।

মুখ তুলিয়া দেখি, ইন্দ্রর দুই চোখ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতেছে। সে কহিল, তুই একটু সরে দাঁড়া শ্রীকান্ত, আমি এ-বেচারাকে ডিঙিতে তুলে ঐ চড়ার ঝাউবনের মধ্যে ফেলে রেখে আসি।

চোখের জল দেখিবামাত্র আমার চোখেও জল আসিতেছিল সত্য, কিন্তু ছোঁয়া-ছুঁয়ির প্রস্তাবে আমি একেবারে সংকুচিত হইয়া পড়িলাম। এ কোন্ রোগের মড়া, কাহার ছেলে, কি জাত—কিছুই না জানিয়া এবং মরিবার পর এ ছোকরা ঠিকমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল কিনা, সে খবরটা পর্যন্ত না লইয়াই বা ইহাকে স্পর্শ করা যায় কিরূপে?

কুণ্ঠিত হইয়া যেই জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জাতের মড়া—তুমি ছোঁবে? ইন্দ্র সরিয়া আসিয়া এক হাত তাহার ঘাড়ের তলায় এবং অন্য হাত হাঁটুর নীচে দিয়া, একটা শুষ্ক তৃণখণ্ডের মত স্বচ্ছন্দে তুলিয়া লইয়া কহিল, নইলে বেচারাকে শিয়ালে ছেঁড়াছিঁড়ি ক'রে খাবে। আহা! মুখে এখনো ওষুধের গন্ধ পর্যন্ত রয়েছে রে! বলিয়া যে তক্তাখানির উপর আমি ইতিপূর্বে শুইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহারই উপর শোয়াইয়া নৌকা ঠেলিয়া দিয়া নিজেও চড়িয়া বসিল। কহিল, মড়ার কি জাত থাকে রে?

আমি তর্ক করিলাম, কেন থাকবে না?

ইন্দ্র কহিল, আরে এ যে মড়া। মড়ার আবার জাত কি? এই যেমন আমাদের ডিঙিটা—এর কি জাত আছে? আমগাছ জামগাছ যে কাঠেরই তৈরী হোক্—এখন ডিঙি ছাড়া একে কেউ বলবে না—আমগাছ, জামগাছ—বুঝলি না? এও তেমনি।

চড়ার উপর আসিয়া অর্ধনগ্ন বনঝাউয়ের অন্ধকারের মধ্যে জলের উপর সেই অপরিচিত শিশু দেহটিকে ইন্দ্র যখন অপূর্ব মমতার সহিত রাখিয়া দিল, তখন রাত্রি আর বাকী নাই। কিছুক্ষণ ধরিয়া সে সেই শবের পানে মাথা ঝুঁকাইয়া থাকিয়া অবশেষে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহার মুখের যতটুকু দেখা গেল, তাহাতে অত্যন্ত ম্লান এবং উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলে যেরূপ দেখায় তাহার শুষ্কমুখে ঠিক সেই ভাব প্রকাশ পাইল।

আমি বলিলাম, ইন্দ্র চল।

ইন্দ্র অন্যমনস্কভাবে কহিল, কোথায়?

এই যে বললে, কোথায় যাবে?

থাক্—আজ আর না।

আমি খুশি হইয়া কহিলাম, বেশ, তাই ভাল ভাই—চল বাড়ী যাই। প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, হাঁ রে শ্রীকান্ত, মরলে মানুষ কি হয় তুই জানিস্?

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, না ভাই জানি নে। তুমি বাড়ী চল। তারা সব স্বর্গে যায় ভাই। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে বাড়ী রেখে এস।

[সংক্ষেপিত]

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১। শ্মশান ঘাটের কাছে বাতাসে যে দুর্গন্ধ আসিতেছিল ইন্দ্র কিভাবে তাহার কারণ ব্যাখ্যা করিল?

২। 'তিনবার 'রাম' নাম করলে কার সাধ্যি কাছে আসে!' —এই কথা কে, কাহাকে, কখন বলিয়াছিল? এই কথায় বক্তার চরিত্রের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

৩। 'অকাল-মৃত্যু বোধ করি আর কখনও তেমন করুণভাবে আমার চোখে পড়ে নাই।' —অকালমৃত্যুর এই করুণ অভিজ্ঞতার কথা বক্তা কি বলিয়াছে? এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রনাথের চরিত্রের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

৪। 'ছোঁয়াছুঁয়ির প্রস্তাবে আমি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম।' —বক্তা কে? ছোঁয়াছুঁয়ির প্রস্তাবটি কি? বক্তার সঙ্কুচিত হইবার কারণ কি?

৫। 'মড়ার কি জাত থাকে রে?' —কোন্ প্রসঙ্গে, কে এই উক্তি করিয়াছিল? এই কথার পিছনে তাহার যুক্তি কি? এই কথার মধ্যে বক্তার চরিত্রের কি পরিচয় জানা যায়?

৬। 'মরলে মানুষ কি হয় তুই জানিস্?' —কে, কাহাকে, কখন এই প্রশ্ন করিয়াছিল? উদ্দিষ্ট ব্যক্তি এই প্রশ্নের কি উত্তর দিয়াছিল?

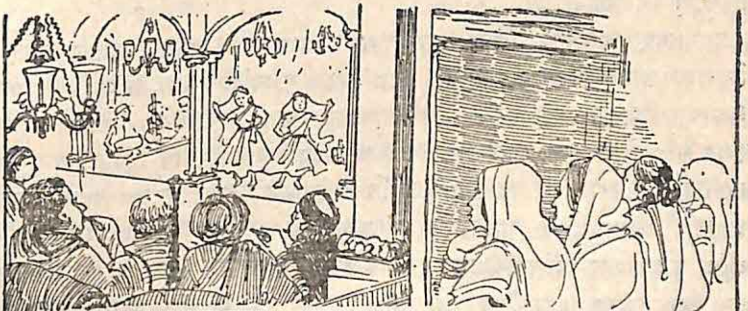
৭। এই গল্প পড়িয়া ইন্দ্রনাথের নির্ভীকতা ও মানবমমতার কি পরিচয় পাওয়া যায়?

৮। অর্থ লিখ :— অনুকূল; দৃষ্টিপাত; হৃদয়ভেদী; বহুদূরাগত; করুণভাবে; নিবিড়; নির্বাক; আকস্মিক; বিসূচিকা; নিদারুণ; সন্তর্পণে; সঙ্কুচিত; প্রায়শ্চিত্ত; কুণ্ঠিত; উৎকর্ণ; অন্যমনস্কভাবে; অর্ধমগ্ন; স্বচ্ছন্দে; বৃহৎকায়; অবিশ্রাম; হৃষ্টপুষ্ট; সুকুমার।

৯। বানান শিখ :— স্বচ্ছন্দে; বিসূচিকা; প্রায়শ্চিত্ত; উৎকর্ণ; নিবিড়; অনুকূল; সন্তর্পণে; শ্মশান; নিশীথ; আর্তনাদ; পূর্বাহ্ণ; ক্ষণকাল; স্পর্শ; জ্যোৎস্না; দুঃখ; চীৎকার; তৃণখণ্ড।

১০। বাক্য রচনা কর :— তর্‌তর্; ক্ষণকাল; দৃষ্টিপাত; মহাকরুণ; হৃদয়ভেদী; নিবিড়; অন্তরালে; অবিশ্রাম; নিদারুণ; অর্ধসুপ্ত; নির্বাক; নিস্তব্ধ; সঙ্কুচিত; বেচারা; স্বচ্ছন্দে; ইতিপূর্বে; অন্যমনস্কভাবে; শুষ্কমুখে; উৎকর্ণ।

১১। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :— বহুদূরাগত; সঙ্কুচিত; নির্বাক; নিস্তব্ধ; স্বচ্ছন্দে; প্রায়শ্চিত্ত; পূর্বাহ্ণ।



সেকালের আমোদ-প্রমোদ

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তখন বড়োদের আমোদে ছেলেরা দূর থেকেও ভাগ বসাতে পেত না। যদি সাহস করে কাছাকাছি যেতুম তা হলে শুনতে হত, 'যাও, খেলা করো গে'। অথচ ছেলেরা খেলায় যদি উচিতমত গোল করত তা হলে শুনতে হত, 'চুপ করো'। বড়োদের আমোদ-আহ্লাদ যে সব সময় খুব যে চুপচাপে সারা হত তা নয়। তাই দূর থেকে কখনও কখনও ঝর্ণার ফেনার মতো তার কিছু কিছু পড়ত ছিটকিয়ে আমাদের দিকে। এ বাড়ির বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে থাকতুম, দেখতুম, ও-বাড়ির নাচঘর আলোয় আলোময়। দেউড়ির সামনে বড়ো বড়ো জুড়িগাড়ি এসে জুটেছে। সদর দরজার কাছ থেকে দাদাদের কেউ কেউ অতিথিদের উপরে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। গোলাপ-পাশ থেকে গায়ে গোলাপজল ছিটিয়ে দিচ্ছেন, হাতে দিচ্ছেন ছোটো একটি করে তোড়া। নাটকের থেকে কুলীন মেয়ের ফুঁপিয়ে কান্না কখনও কখনও কানে আসে, তার মর্ম বুঝতে পারি নে। বোঝার ইচ্ছেটা হয় প্রবল। খবর পেতুম, যিনি কাঁদতেন তিনি কুলীন বটে, কিন্তু তিনি আমার ভগ্নীপতি। তখনকার পরিবারে যেমন মেয়ে আর পুরুষ ছিল দুই সীমানার দুই দিকে, তেমনি ছিল ছোটোরা আর বড়োরা। বৈঠকখানায় ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় চলছে নাচগান ; গুড়গুড়ি টানছেন বড়োর দল ; মেয়েরা লুকোনো থাকতেন ঝরোখার ওপারে চাপা আলোয় পানের বাটা নিয়ে। সেখানে বাইরের মেয়েরা এসে জমতেন, ফিস্ ফিস্ করে চলত গেরস্তালির খবর। ছেলেরা তখন

বিছানায়। পিয়ারী কিংবা শংকরী গল্প শোনাচ্ছে, কানে আসছে—'জোচ্ছনায় যেন ফুল ফুটেছে'......

আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনী ঘরে ছিল শখের যাত্রার চলন। মিহি-গলাওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দলবাঁধার ধুম ছিল। আমার মেজকাকা ছিলেন এই রকম একটি শখের দলের দলপতি। পালা রচনা করবার শক্তি ছিল তাঁর, ছেলেদের তৈরি করে তোলবার উৎসাহ ছিল। ধনীদের ঘর-পোষা এই যেমন শখের যাত্রা তেমনি ব্যবসাদারী যাত্রা নিয়েও বাংলাদেশের ছিল ভারী নেশা। এ পাড়ায়, ও পাড়ায়, এক-একজন নামজাদা অধিকারীর অধীনে যাত্রার দল গজিয়ে উঠত। দলকর্তা অধিকারীরা সবাই যে জাতে বড়ো কিংবা লেখাপড়ায় এমন-কিছু তা নয়। তারা নাম করেছে আপন ক্ষমতায়।

আমাদের বাড়িতে যাত্রাগান হয়েছে মাঝে মাঝে। কিন্তু রাস্তা নেই, ছিলুম ছেলেমানুষ। আমি দেখতে পেয়েছি তার গোড়াকার জোগাড়-যন্তর। বারান্দা জুড়ে বসে গেছে দলবল, চারিদিকে উঠছে তামাকের ধোঁওয়া। ছেলে-গুলো লম্বা-চুল-ওয়ালা, চোখে-কালি-পড়া; অল্প বয়সে তাদের মুখ গিয়েছে পেকে, পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট গিয়েছে কালো হয়ে। সাজগোজের আসবাব আছে রঙ-করা টিনের বাক্সোয়। দেউড়ির দরজা খোলা, উঠোনে পিল্ পিল্ করে ঢুকে পড়ছে লোকের ভিড়। চারদিকে টগ্‌বগ্ করে আওয়াজ উঠছে, ছাপিয়ে পড়ছে গলি পেরিয়ে চিৎপুরের রাস্তায়। রাত্রি হবে ন'টা; পায়রার পিঠের উপর বাজপাখির মতো হঠাৎ এসে পড়ে শ্যাম, কড়াপড়া শক্ত হাতের মুঠি দিয়ে আমার কনুই ধরে বলে, 'মা ডাকছে, শোবে চলো।' লোকের সামনে টানাহেঁচড়ায় মাথা হেঁট হয়ে যেত, হার মেনে চলে যেতুম শোবার ঘরে। বাইরে চলছে হাঁকডাক, বাইরে জ্বলছে ঝাড়-লণ্ঠন। আমার ঘরে সাড়াশব্দ নেই, পিলসুজের উপর টিম্‌টিম্ করছে পিতলের প্রদীপ। ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে নাচের তাল সমে এসে ঠেকতেই ঝমাঝম করতাল।

সব-তাতে মানা করাটাই বড়োদের ধর্ম। কিন্তু একবার কী কারণে তাঁদের মন নরম হয়েছিল, হুকুম বেরোল ছেলেরাও যাত্রা শুনতে পাবে। ছিল নলদময়ন্তীর পালা। আরম্ভ হবার আগে রাত এগারোটা পর্যন্ত বিছানায় ছিলুম ঘুমিয়ে। বার বার ভরসা দেওয়া হল, সময় হলেই আমাদের জাগিয়ে দেবে। উপরওয়ালাদের দস্তুর জানি, কথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। কেননা, তাঁরা বড়ো আমরা ছোটো।

সে রাত্রে নারাজ দেহটাকে বিছানায় টেনে নিয়ে গেলুম। তার একটা

কারণ, মা বললেন, তিনি স্বয়ং আমাকে জাগিয়ে দেবেন। আর একটা কারণ, ন'টার পরে নিজেকে জাগিয়ে রাখতে বেশ একটু ঠেলাঠেলির দরকার হত। এক সময়ে ঘুম থেকে উঠিয়ে আমাকে নিয়ে আসা হল বাইরে। চোখে ধাঁধা লেগে গেল। একতলায় দোতলায় ঝাড়-লণ্ঠন থেকে ঝিলিমিলি আলো ঠিকরে পড়ছে চারদিকে, সাদা বিছানো চাদরে উঠোনটা ঠেকছে মস্ত। একদিকে বসে আছেন বাড়ির কর্তারা আর যাঁদের ডেকে আনা হয়েছে। বাকি জায়গাটা যার খুশি যেখান থেকে এসে ভরাট করেছে। থিয়েটার এসেছিলো পেটে-সোনার-চেন-ঝোলানো নামজাদার দল, আর এই যাত্রার আসরে বড়োয় ছোটোয় ঘেঁষাঘেঁষি। তাদের বেশির ভাগ মানুষই, ভদ্দরলোকেরা যাদের বলে 'বাজে লোক'। তেমনি আবার পালা-গানটা শেখানো হয়েছে এমন সব শিখিয়ে দিয়ে যারা হাত পাকিয়েছে খাগড়া-কলমে, যারা ইংরেজি কপি-বুকের মক্শো করে নি। এর সুর, এর নাচ, এর সব গল্প বাংলাদেশের হাট-ঘাট মাঠের পয়দা-করা; এর ভাষা পণ্ডিতমশায় দেন নি পালিশ করে।

সভায় যখন দাদাদের কাছে এসে বসলুম, রুমালে কিছু কিছু টাকা বেঁধে আমাদের হাতে দিয়ে দিলেন। বাহবা দেবার ঠিক জায়গাটাতে ঐ টাকা ছুঁড়ে দেওয়া ছিল রীতি। এতে যাত্রাওয়ালার ছিল উপরি পাওনা, আর গৃহস্থের ছিল খোশনাম।

রাত ফুরোত, যাত্রা ফুরোতে চাইত না। মাঝখানে নেতিয়ে-পড়া দেহটাকে আড়কোলা করে কে যে কোথায় নিয়ে গেল জানতেও পারি নি। জানতে পারলে সে কি কম লজ্জা—যে মানুষ বড়োদের সমান সারে বসে বকশিস দিচ্ছে ছুঁড়ে, উঠোনসুদ্ধ লোকের সামনে তাকে কিনা এমন অপমান! ঘুম যখন ভাঙল দেখি মায়ের তক্তাপোশে শুয়ে আছি। বেলা হয়েছে বিস্তর, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। সূর্য উঠে গেছে অথচ আমি উঠি নি, এ ঘটে নি আর কোনো দিন।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১। ঠাকুর বাড়িতে সেকালের আমোদ-প্রমোদের একটি নমুনা আঁক। এই সব আমোদ-প্রমোদে বাচ্চা ছেলেদের অবস্থা কি রকম হইত?

২। শখের যাত্রা ও ব্যবসাদারী যাত্রায় পার্থক্য কি? রবীন্দ্রনাথের মেজকাকার শখের যাত্রা কি রকম ছিল?

৩। 'আমি দেখতে পেয়েছি তার গোড়াকার জোগাড় যন্তর'। —এই জোগাড় যন্তর কিসের ও কি রকম ছিল?

৪। 'পায়রার পিঠের উপর বাজপাখির মতো হঠাৎ এসে পড়ে শ্যাম'—এই কথাটির তাৎপর্য কি?

৫। 'সব-তাতে মানা করাটাই বড়োদের ধর্ম'—এই কথার অর্থ বুঝাইয়া দাও।

৬। 'কেননা, তাঁরা বড়ো, আমরা ছোটো'। —লেখক কোন্ প্রসঙ্গে এই অভিযোগের কথা প্রকাশ করিয়াছেন?

৭। ঠাকুর বাড়িতে যাত্রা উৎসবে বালক রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দাও।

৮। অর্থ লিখ ঃ— দেউড়ি, জুড়িগাড়ি, কুলীন, গেরস্তালি, ব্যবসাদারী, খোশনাম।

৯। বাক্য রচনা কর ঃ— উচিত মত, গেরস্তালি, ব্যবসাদারী, গোড়াকার, পিল্‌পিল্‌, টগবগ, টানাহেঁচড়া, টিমটিম, দস্তুর, ঝিলিমিলি, ঘেঁষাঘেঁষি, নেতিয়েপড়া, আড়কোলা, মিহিগলাওয়ালা।

১০। 'তোমার দেখা একটি অভিনয়'—বিষয়ে সংক্ষেপে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

হিমালয় বক্ষে



—জলধর সেন

['ভারতবর্ষ' মাসিকা পত্রিকার সম্পাদক, সুসাহিত্যিক রায়বাহাদুর জলধর সেন দীর্ঘকাল হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়াছেন। সেখানে তিনি অনেক সাধারণ মানুষ ও সাধু সন্ন্যাসীদের সহিত মিশিয়াছেন। তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে উপহার দিয়াছেন। কত গভীর দরদ লইয়া তিনি হিমালয় প্রকৃতিকে ও সেখানকার মানুষকে দেখিয়াছেন এই কাহিনী পড়িলে বুঝিতে পারিবে।]

সংগী সন্ন্যাসী দুজন আজ সমস্ত দিন বিশ্রাম করবেন, ঠিক করলেন; আমি বেচারা দিনটা কেমন করে কাটাই, ভেবে না পেয়ে বেরিয়ে পড়লুম। অনেকক্ষণ পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ানো গেল, অনেক লোকের সংগে আলাপ হলো। আমি খানিক বেড়াচ্ছি, খানিক বা একটানা পাথরের উপর ব'সে প্রকৃতির শোভা দেখছি: অস্তায়মান সূর্যের রশ্মিজাল পর্বতের পাশ দিয়ে শ্যামল প্রকৃতির মধ্যে এসে বিকীর্ণ হয়ে পড়ছে। আমার দৃষ্টি কখন ধূসর পর্বত-অংগে, কখন সূর্যকিরণে উজ্জ্বল অলকানন্দার উপর।

দেখতে দেখতে কতকগুলি পর্বতবাসিনী রমণী এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। এই নির্জন প্রদেশে আমাকে একা ব'সে থাকতে দেখে তারা যে বিস্মিত হয়েছিল, তা তাদের চাহনিতেই বেশ বুঝতে পারা গেল। ধীরে ধীরে সাহস পেয়ে তারা আমাকে দুই-একটা ক'রে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে। কেন দেশ ছেড়ে এসেছি, দেশে আমার আর কে আছে, আবার কবে দেশে

ফিরবো, এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দেখলুম, আমার প্রতি সহানুভূতিতে তাদের হৃদয় আর্দ্র হয়ে গেল। তারা প্রকাশ্যে আমায় কিছু না বললেও তাদের মনের ভাব স্পষ্ট বুঝতে পেরে আমার বড় আনন্দ হলো; এই দূরদেশে আমার মত প্রবাসীর প্রতি মা-বোনের স্নেহের আভাস ভারি প্রীতিকর!

অলকানন্দা ও গঙ্গার সঙ্গমের নিকটে একটু নির্জন জায়গা আছে। বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যার একটু আগে সেখানে গিয়ে একটা শিলাখণ্ডে ব'সে পড়লুম। নদীর কলতানের সঙ্গে প্রাণ ভেসে যেতে লাগলো। সন্ধ্যা হতে আর বেশি বিলম্ব নেই; কিন্তু আমার সে জায়গা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হলো না।

নদীর দিক হতে মুখ ফিরিয়ে পিছনে চাইতেই দেখি একটু দূরে দুটি মেয়ে,—বেশ সুন্দর দেখতে। অপরিষ্কৃত বেশ, চুলগুলো এলোমেলো হয়ে এদিকে ওদিকে লতিয়ে পড়েছে, হাতে কতকগুলো সুন্দর লতাপাতা ও ফুল। তারা উপর থেকে নেমে আসছিল। আমাকে দেখে তারা একটু থমকে দাঁড়ালো, দুজনে কি বলাবলি করলে, তারপর যে দিক থেকে এসেছিল, সেই পথে ফিরে যাবার যোগাড় করলে।

আমি তাদের সঙ্গে কথা কইবার প্রলোভন কিছুতেই সংবরণ করতে পারলুম না! তাদের ডাকতেই ফিরে এল। মেয়ে দুটির মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত বড়, সে একটু বেশি লাজুক। সে সলজ্জভাবে পাশের একটি বড় পাথরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আজন্ম পার্বত্য প্রকৃতির মধ্যে বর্ধিত হলেও তার লজ্জাশীলতা দেখলুম আমাদের বঙ্গ-বালিকার মতই প্রবল এবং সেইরকম মধুর। ছোট মেয়েটি আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। আমি তাদের বাড়ি কোথা, কে আছে, কয় ভাই, কয় বোন প্রভৃতি প্রশ্নে আলাপ আরম্ভ করলুম। প্রথমে তাদের কথা কইতে একটু বাধ-বাধ ঠেকলো, কিন্তু শীঘ্রই সে সঙ্কোচভাব দূর হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হলো, সব কথা মনে নেই, কিন্তু একটা কথা আমার বড় বেজেছিল, তাই সেটা বেশ মনে আছে।

আমি যখন তাকে বললুম যে, আমার বাপ নেই, স্ত্রী নেই, ছেলেও নেই, তখন সে তার করুণ ও আয়ত চক্ষুদুটি আমার মুখের উপর রেখে অতি কোমলস্বরে বললে,—"লেড়্‌কি ভি নেই?" কথাটা আমার প্রাণে তীরের মত বিদ্ধ হলো! আমার একটি 'লেড়্‌কি' ছিল, জানিনে কোন্ অপরাধে তাকে তিন বৎসর হারিয়েছি! আজ এই বালিকার একটি কোমল প্রশ্নে সেই সুপ্তস্মৃতি

জেগে উঠলো। আমার চোখে জল দেখে বালিকার মুখখানি কেমন শুকিয়ে গেল। সে তার অপরিষ্কার ওড়না দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিল। আর সেই স্নেহস্পর্শে, তার অকপট সহানুভূতিতে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম। বালিকা আমাকে আর কোন কথা বলতে পারলে না। আমি জানতে পারলুম মেয়েটি তার মা-বাপের একমাত্র সন্তান, তাই বুঝি তার মনে হয়েছিল মানুষের একটি মেয়েও না থাকা কতটা অসম্ভব।

সন্ধ্যা বেশ ঘন হয়ে এল। মেয়ে দুটি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলতে লাগলো, আর ঘন ঘন 'হুঁশিয়ার' 'খবরদার' বলতে লাগলো, পাছে আমার পায়ে ঠক্কর লেগে আমার পায়ে ব্যথা হয়। আমাকে তারা রাস্তায় তুলে দিয়ে বিদায় নিলে। আমার বড় কষ্টবোধ হলো।—হায়, আবার কখন কি জীবনে তাদের সঙ্গে দেখা হবে? যদিই বা হয়, তা হলে আর কি তাদের সেই করুণা-রূপিণী সরলা বালিকা-মূর্তিতে দেখবো?—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাসার দিকে অগ্রসর হলুম।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১। পর্বত-বাসিনী রমণীদের সহিত লেখকের কখন কিভাবে পরিচয় হইল? এই পরিচয়ের বর্ণনা দাও।

২। দুইটি পার্বত্য মেয়ের সহিত লেখকের পরিচয় কিভাবে হইল? তাহাদের প্রকৃতি কিরূপ? লেখক তাহাদের সহিত কথা বলিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলেন না কেন?

৩। —"একটা কথা আমার বড় বেজেছিল, তাই সেটা বেশ মনে আছে।"—কোন্ কথা, কাহার, কেন বাজিয়াছিল? সংক্ষেপে বুঝাইয়া লিখ।

৪। "আর কি তাদের সেই করুণারূপিণী সরলা বালিকা-মূর্তিতে দেখবো?"—এখানে কাহাদের কথা বলা হইয়াছে? লেখকের সহিত তাহাদের পরিচয় সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫। হিমালয়ে প্রকৃতির যে পরিচয় এই প্রবন্ধে পাওয়া যায়—তাহা সংক্ষেপে গুছাইয়া লিখ।

৬। অর্থ লিখ :— বিকীর্ণ, অস্তায়মান, আর্দ্র, কলতান, আয়ত, সংকোচ ভাব, সুপ্তস্মৃতি, রশ্মিজাল, ধূসর, সলজ্জভাবে।

৭। বাক্য রচনা কর :— অস্তায়মান, চাহনি, বিস্মিত, আভাস, সলজ্জভাবে, অপেক্ষাকৃত, লজ্জাশীলতা, আয়ত, কোমলস্বরে, স্নেহস্পর্শে, হুঁশিয়ার, অকপট, করুণারূপিণী।

৮। বানান শিখ ঃ— সন্ন্যাসী, রমণী, বিকীর্ণ, সহানুভূতি, প্রীতিকর, আভাস, সন্ধ্যা, নির্জন, পার্বত্য, করুণা, সলজ্জ, প্রবাসী, আজন্ম, স্মৃতি, মূর্তি, দীর্ঘনিশ্বাস।

৯। লিঙ্গ পরিবর্তন কর ঃ— সন্ন্যাসী, প্রকৃতি, পর্বতবাসিনী, রমণী, নদী, মেয়ে, বালিকা, লজ্জাশীলা, সরলা, করুণারূপিণী।

১০। কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ—

(ক) তাদের চাহনিতে বেশ বুঝতে পারা গেল। (খ) আমার প্রতি সহানুভূতিতে তাদের হৃদয় আর্দ্র হয়ে গেল। (গ) আমার সে জায়গা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হল না। (ঘ) সব কথা মনে নেই। (ঙ) সেই স্নেহস্পর্শে, আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম।

১১। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ— সন্ন্যাসী, উজ্জ্বল, সংবরণ, সঙ্কোচ, সহানুভূতি।

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের শিল্প-বাণিজ্যাদি



—খগেন্দ্রনাথ মিত্র

[লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ছিলেন। বাংলার বৈষ্ণবসাহিত্যের অন্যতম বিশেষজ্ঞ। কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছেন। নিম্নের রচনাটিতে হিন্দু-বৌদ্ধযুগের শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।]

হিন্দু-বৌদ্ধ-যুগের শিল্পকলা উৎকর্ষের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। প্রস্তর কাটিয়া মন্দির, মঠ ও স্তম্ভ নির্মাণ করিতে ভারতীয়েরা শিল্প-কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু দ্বারা নানা কারুকার্যময় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে জানিতেন। নেপালে ধাতুর কাজ হইত অতি সুন্দর। তখন এ দেশে তুলা ও রেশমের সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ঢাকার মসলিন বা সূক্ষ্মবস্ত্র সে কালেও প্রসিদ্ধ ছিল। রোম প্রভৃতি সভ্য দেশে ইহা আদৃত হইত। অশোকের সময় হইতে স্থাপত্য-বিদ্যা ও ভাস্কর্য অদ্ভুত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সারনাথের সিংহচূড়া প্রভৃতি যে সকল ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বিলক্ষণ শিল্প-নৈপুণ্য রহিয়াছে। বৌদ্ধেরা মন্দির-নির্মাণে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈনদিগের অনুকরণে হিন্দুরাও মন্দির ও মূর্তি-নির্মাণে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইয়াছেন। এলোরার কৈলাসমন্দির, ভুবনেশ্বরের শিবমন্দির, পুরীর জগন্নাথমন্দির, দ্বারসমুদ্রের হোয়শালদিগের মন্দির, কাঞ্চীর পল্লবদিগের মন্দির প্রভৃতি হিন্দু স্থাপত্য-শিল্পের সুন্দর নিদর্শন। সে সময়ে চিত্র-

কলারও চরমোৎকর্ষ হইয়াছিল। সাঁচিস্তূপে যে সকল চিত্র আছে তাহা অতি সুন্দর! অজন্তার চিত্রগুলি এত সুন্দর যে, এত কাল পরেও সেগুলি যেন সজীব মনে হয়। একজন ইউরোপীয় রূপদক্ষ বলিয়াছেন যে, অজন্তা-গুহাচিত্রে বিশুদ্ধ ভারতীয় চিত্রশিল্প উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। এক সময়ে ভারতীয় শিল্পে গ্রীকদিগের প্রভাব থাকিলেও খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর হিন্দু-শিল্পকলা ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সহিত বিদেশীয় জাতির সংস্রব একরূপ উঠিয়া গিয়াছিল। অনেকে মনে করেন যে, অষ্টম শতাব্দীর ভারতীয় শিল্পই সর্বোৎকৃষ্ট। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট্ স্মিথের মতে গুপ্তসম্রাটদিগের সময়ে, বিশেষতঃ পঞ্চম শতাব্দীতেই, সঙ্গীত, স্থপতিশিল্প, ভাস্কর্য এবং চিত্রবিদ্যা উন্নতির উচ্চশিখরে উঠিয়াছিল।

অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুরা সমুদ্রপথে যাতায়াত করিতেন। লঙ্কা, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বালী প্রভৃতি দ্বীপে হিন্দুরা বাণিজ্যার্থ যাইতেন। এই সকল দ্বীপে ভারতীয় ধর্ম ও ভারতীয় দেবদেবীর মূর্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। অশোকের প্রচারকগণ সিংহল প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। চীন ঐতিহাসিকগণ বলেন যে কাশ্মীরের যুবরাজ গুণবর্মা যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। যবদ্বীপের বরবুদোরের মন্দিরে বুদ্ধদেবের মূর্তি ও রামায়ণের ঘটনাবলী পাথরে ক্ষোদিত আছে। ভারতীয় শিল্প, সিংহল এবং পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে অনুসৃত হইত। সিংহলের হিন্দুমন্দির প্রাচীন চোলরাজগণের শিল্পের আদর্শে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। যবদ্বীপের উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখিলে রাজেন্দ্রচোলের রাজধানী গঙ্গাইকোণ্ডার ক্ষোদিত মূর্তির কথা মনে পড়ে।

অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে রীতিমত বাণিজ্য চলিত। বিদেশের সহিতও বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল। স্থলপথে ও জলপথে যে সকল পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি হইত তৎসম্বন্ধে নানা বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রয়োজন হইয়াছিল। বারাণসী, মাদুরা, কোঙ্কন প্রভৃতি দেশে সুন্দর সুন্দর বস্ত্র নির্মিত হইত। চীনদেশ হইতেও বস্ত্রের আমদানি হইত। তিব্বত ও চীনের সহিত ভারতের সম্বন্ধ অতি প্রাচীনকাল হইতেই ছিল। নেপালের সহিত তিব্বতের এবং তিব্বতের সহিত চীনের সম্বন্ধ থাকায় বৌদ্ধযুগেও ভারতের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানের সুযোগ ঘটিয়াছিল। চীন হইতে ফা-হিয়ান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পর্যটকেরা ভারতে তীর্থযাত্রায়

আসিতেন। ভারত হইতেও কুমারজীব প্রভৃতি বৌদ্ধ আচার্যগণ চীনে গিয়াছিলেন।

এ সময়ে স্থলপথে চীন, তিব্বত, মধ্য-এশিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের সুবিধা ছিল, এইরূপ মনে হয়। এই যুগে ভারতবর্ষের ও ইউরোপের মধ্যেও বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল। আলেকজান্দারের দিগ্বিজয়ের পরে লোহিত সাগরের পথে ভারতের ও পূর্বদ্বীপপুঞ্জের পণ্যদ্রব্য ভূমধ্যসাগর দিয়া ইউরোপের অন্যান্য দেশে যাইত।

ভারতের পশ্চিম উপকূলে ভৃগুকচ্ছ (ব্রোচ) ইউরোপীয় বাণিজ্যের একটি প্রধান বন্দর ছিল। অশোকের সময়ে, এমন কি বুদ্ধের সময়েও বঙ্গদেশে তাম্রলিপ্ত বা তমলুক সমুদ্রকূলে বন্দর ছিল। এখন ইহা সমুদ্রকূল হইতে ষাট মাইল দূরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র নগর। পশ্চিম উপকূলে বল্লভী নগর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল। তামিল দেশের সহিত রোমক সাম্রাজ্যের বাণিজ্য চলিত এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এ দেশ হইতে কার্পাস ও রেশমের বস্ত্র, মশলা, মণিমুক্তা ইত্যাদি বিদেশে চালান যাইত। বিদেশ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল, কাচ, টিন ইত্যাদি এদেশে আসিত।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১। টীকা লিখ ঃ— স্থাপত্যবিদ্যা, ভাস্কর্য, সাঁচিস্তূপ, বরবুদোরের মন্দির, ফা-হিয়েন, কুমারজীব, চিত্রবিদ্যা, মস্‌লিন, অর্থশাস্ত্র।

২। প্রাচীন ভারতে হিন্দু-বৌদ্ধযুগের শিল্পকলার উৎকর্ষের পরিচয় দাও।

৩। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুরা যে সমুদ্র পথে যাতায়াত করিতেন তাহার দৃষ্টান্ত দাও।

৪। দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশের সহিত প্রাচীন ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের পরিচয় দাও।

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—

ঢাকার —— সেকালেও প্রসিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধেরা —— বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। এলোরার ——, ভুবনেশ্বরের ——, পুরীর —— হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের সুন্দর নিদর্শন। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুরা —— যাতায়াত করিতেন। যবদ্বীপের —— মন্দিরে বুদ্ধদেবের মূর্তি ও —— ঘটনাবলী পাথরে ক্ষোদিত আছে।

আলোকজান্দারের দিগ্বিজয়ের পরে —— সাগরের পথে ভারতের পণ্যদ্রব্য —— দিয়া ইউরোপের অন্যান্য দেশে যাইত। অশোকের সময়ে বঙ্গদেশে —— সমুদ্রকূলে বন্দর ছিল।

৬। শব্দার্থ লিখ ঃ— পরাকাষ্ঠা, পারদর্শী, রূপদক্ষ, চরমোৎকর্ষ, বিধিব্যবস্থা, শিল্প-নৈপুণ্য, বিলক্ষণ।

৭। বাক্য রচনা কর ঃ— রীতিমত, বিলক্ষণ, পরাকাষ্ঠা, উপনীত, রূপদক্ষ, দিগ্বিজয়, সর্বোৎকৃষ্ট, বিধিব্যবস্থা, বিস্তৃত, উৎকর্ষ।

৮। বানান শিখ ঃ— উৎকর্ষ, স্বর্ণ, সূক্ষ্ম, বিলক্ষণ, প্রদর্শন, নিদর্শন, রীতিমত, পণ্যদ্রব্য, ভাস্কর্য, প্রতীচ্য, উপকূল।

৯। সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ— দিগ্বিজয়, বাণিজ্যার্থ, শতাব্দী, চরমোৎকর্ষ, ভুবনেশ্বর, সর্বোৎকৃষ্ট, ভগ্নাবশেষ, যাতায়াত, অন্যান্য।



সরস্বতী কুণ্ডীর রূপমায়া

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[প্রকৃতিপ্রেমিক ঔপন্যাসিক, 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের রচয়িতা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথা সাহিত্যে উচ্চ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার রচনা শৈলী সম্পূর্ণ নিজস্ব, সাবলীল, সরল ও স্বচ্ছন্দ। প্রকৃতির রূপমায়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। প্রকৃতিকে তিনি জীবন্ত সত্তারূপে আবিষ্কার করিয়াছেন। আধুনিক কালের 'শহুরে সাহিত্যে' তিনি একটি চিরকালীন শান্ত, সুন্দর সুরের সৃষ্টি করিয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি ছোটনাগপুর অঞ্চলের লবটুলিয়া বইহারের প্রকৃতির সৌন্দর্যের বর্ণনা করিয়াছেন।]

লবটুলিয়ার উত্তর প্রান্ত খুব বড় একটা হ্রদের মত। এরকম জলাশয়কে এদেশে বলে কুণ্ডী। এই হ্রদটার নাম সরস্বতী কুণ্ডী।

সরস্বতী কুণ্ডীর পারের তিনদিকে নিবিড় বন। এ বনে বড় বড় বনস্পতির নিবিড় সমাবেশ—জলের সান্নিধ্যবশতই হোক বা যে জন্যই হোক, বনের তলদেশে নানা বিচিত্র লতাপাতা বন্য পুষ্পের ভিড়। এই বন বিশাল সরস্বতী কুণ্ডীর নীল জলকে তিনদিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। একদিকে ফাঁকা—সেখান হইতে পূর্বদিকের বহুদূর প্রসারিত নীল আকাশ ও দূরের শৈলমালা চোখে পড়ে। বামে চাহিলে গভীর হইতে গভীরতর বনের মধ্যে দৃষ্টি চলিয়া গিয়া ঘন নিবিড় শ্যামলতার মধ্যে নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলে। দক্ষিণে চাহিলে স্বচ্ছ নীল জলের ওপারে সুদূরবিসর্পী আকাশ ও অস্পষ্ট শৈলমালার ছবি মনকে বেলুনের মত ফুলাইয়া পৃথিবীর মাটিতে উড়াইয়া লইয়া চলে।

হ্রদের তীরের নিবিড় বন প্রায় তিন মাইলের উপর লম্বা, গভীরতায় প্রায় দেড় মাইল। জলের ধার দিয়া বনের গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় একটা সঁড়ি পথ বনের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত আসিয়াছে—এই পথ ধরিয়া বেড়াইতাম। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে সরস্বতীর নীল জল, তার উপর উপুড় হইয়া-পড়া দূরের আকাশটা এবং দিগন্তলীন শৈলশ্রেণী চোখে পড়িত। ঝির্ ঝির্ করিয়া স্নিগ্ধ হাওয়া বহিত, পাখি গান গাহিত, বন্য ফুলের সুগন্ধ পাওয়া যাইত।

একদিন একটা গাছের ডালে উঠিয়া বসিলাম। সে-আনন্দের তুলনা হয় না। আমার মাথার উপর বিশাল বনস্পতিদলের ঘন সবুজ পাতার রাশি, তার ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের টুক্‌রা, প্রকাণ্ড একটা লতায় থোকা থোকা ফুল দুলিতেছে। পায়ের দিকে অনেক নীচে ভিজা মাটিতে বড় বড় ব্যাঙের ছাতা গজাইয়াছে। এখানে আসিয়া বসিয়া শুধু ভাবিতে ইচ্ছা হয়। প্রত্যেক বৃক্ষলতার হৃৎস্পন্দন যেন নিজের বুকের রক্তের শান্ত স্পন্দনের মধ্যে অনুভব করা যায়। স্তব্ধ দুপুরে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এখানে তীর-তরুর ছায়ায় বসিয়া পাখির কূজন শুনিতে শুনিতে মন কতদূরে কোথায় চলিয়া যাইত, বন্য নিমগাছের সুগন্ধি নিমফুলের সুবাস ছড়াইত বাতাসে, জলে জলজ লিলির দল ফুটিত।

সেদিন ফিরিতেছিলাম বেলা তিনটার সময়। খররৌদ্রে বিস্তীর্ণ রৌদ্র-দগ্ধ প্রান্তর পার হইয়া ঘর্মাক্ত কলেবরে বনের মধ্যে ঢুকিয়া ঘন ছায়ায় ছায়ায় জলের ধার পর্যন্ত গেলাম। একটা গাছের ডালে ঘোড়া বাঁধিয়া নিবিড় ঝোপের তলায় একখানা অয়েলক্লথ পাতিয়া একেবারে শুইয়া পড়িলাম। ঘন ঝোপের ডালপালা চারিধার হইতে এমনভাবে আমায় ঢাকিয়াছে যে বাহির হইতে আমার কেউ দেখিতে পাইবে না। একটা কি গাছ হইতে হাতখানেক লম্বা বড় বড় বনসিমের মত সবুজ ফল আমার প্রায় বুকের উপর দুলিতেছে। আর একটা কি গাছ, তার ডালপালা প্রায় অর্ধেক ঝোপটা জুড়িয়া, তাহাতে কুচো কুচো ফুল ধরিয়াছে, ফুলগুলি এত ছোট যে কাছে না গেলে চোখে পড়ে না—কিন্তু কি ঘন, নিবিড় সুবাস সে-ফুলের!

সরস্বতী কুণ্ডীর বন পাখির আড্ডা। এত পাখিও আছে এখানকার বনে! কত ধরণের, কত রংবেরঙের পাখি—শ্যামা, শালিক, হরটিট্, বনটিয়া, চড়াই, ছাতারে, ঘুঘু, হরিয়াল। উঁচু গাছের মাথায় বাজবৌরী, চিল, কুল্লো—সরস্বতীর নীল জলে বক, সিল্লী, রাঙা হাঁস, মাণিকপাখি, কাঁক প্রভৃতি

জলচর পাখি—পাখির কাকলিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে ঝোপের উপরটা, কি বিরক্তই করে তারা, তাদের উল্লাসভরা অবাক কূজনে কানপাতা দায়। অনেক সময় মানুষকে গ্রাহ্যই করে না, আমি শুইয়া আছি দেখিতেছে, আমার চারিপাশে হাত দেড়-দুই দূরে তাহারা ঝুলন্ত ডালপালায় লতায় বসিয়া কিচ্ কিচ্ করিতেছে—আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই।

এখানেই এদিন প্রথম বন্য হরিণ দেখিলাম। শুইয়া আছি—হঠাৎ কিসের পায়ের শব্দে উঠিয়া বসিয়া মাথার শিয়রের দিকে চাহিয়া দেখি ঝোপের নিভৃততর দুর্গমতর অঞ্চলে নিবিড় লতাপাতার জড়াজড়ির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একটা হরিণ। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি, বড় হরিণ নয়, হরিণশাবক। খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল, দুজনেই নির্বাক, নিস্পন্দ। হরিণ-শিশুটির চোখে ঠিক যেন মনুষ্যশিশুর মত সাগ্রহ কৌতূহলের দৃষ্টি। আরও কাছে আসিত কিনা জানি না। আমার ঘোড়াটা সে সময় হঠাৎ পা নাড়িয়া গা ঝাড়া দিয়া ওঠাতে হরিণশিশু চকিত ও সন্ত্রস্তভাবে ঝোপের মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া তাহার মায়ের কাছে সংবাদটা দিতে গেল।

রোদ ক্রমশ রাঙা হইয়া আসিল। ওপারে শৈলচূড়ায় যেন তামার রং ধরিয়াছে। বকের দল ডানা মেলিয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। গাছপালার মগডালে রোদ উঠিয়া গেল। পাখির কূজন বাড়িল, আর বাড়িল অজানা বনকুসুমের সেই সুঘ্রাণটা। অপরাহ্ণের ছায়ায় গন্ধটা যেন আরও ঘন, আরও সুমিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটা বেজি খানিক দূর হইতে মাথা উঁচু করিয়া আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছে।

কি নিভৃত শান্তি! কি অদ্ভুত নির্জনতা! এতক্ষণ তো এখানে আছি, সাড়ে তিনঘণ্টার কম নয়—বন্য পাখির কাকলি ছাড়া আর কোন শব্দ শুনি নাই, আর পাখিদের পায়ে ডালপাতার মচ্‌মচানি, শুষ্কপত্র বা লতার টুক্‌রা পতনের শব্দ। মানুষের চিহ্ন নাই কোনদিকে।

নানা বিচিত্র ও বিভিন্ন গড়ন বনস্পতিদের শীর্ষদেশের। এই সন্ধ্যার সময় রাঙা রোদ পড়িয়া তাদের শোভা হইয়াছে অদ্ভুত। তাদের কত গাছের মগডাল জড়াইয়া লতা উঠাইয়াছে। এক ধরণের লতাকে এদেশে বলে ভিঁয়োরা লতা—আমি তাহার নাম দিয়াছি ভোম্‌রা লতা। এই সময় ভোম্‌রা লতায় ফুল ফোটে—ছোট ছোট বনজুঁইয়ের মত সাদা ফুলে কত বড় গাছের মাথা আলো করিয়া রাখিয়াছে। অতি চমৎকার সুঘ্রাণ, অনেকটা যেন সর্ষে ফুলের মত—তবে অতটা উগ্র নয়।

সরস্বতী কুণ্ডীর বনে কত বন্য শিউলি গাছ—শিউলি গাছের প্রাচুর্য এক এক জায়গায় এত বেশি, যেন মনে হয় শিউলির বন। বড় বড় শিলা-খণ্ডের উপর শরতের প্রথম সকালবেলা রাশি রাশি শিউলি ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছিল—দীর্ঘ এক রকম কর্কশ ঘাস সেই সব পাথরের আশে পাশে —বড় বড় ময়না-কাঁটার গাছ তার সঙ্গে জড়াইয়াছে—কাঁটা ঘাস, শিলাখণ্ড সব তাতেই রাশি রাশি শিউলি ফুল—আর্দ্র, ছায়াগহন স্থান, তাই সকালের ফুল এখনও শুকাইয়া যায় নাই।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১। সরস্বতী-কুণ্ডীর পারের তিনদিকে যে নিবিড় বন আছে তাহার একটি আলেখ্য অঙ্কিত কর।

২। বনের মধ্যে গাছের ডালে বসিয়া লেখক যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা দাও।

৩। সরস্বতী-কুণ্ডীর বনে লেখক পাখিদের যে আড্ডা দেখিয়াছেন তাহার বর্ণনা দাও।

৪। বনের মধ্যে হরিণ শাবক দেখিয়া লেখক কিরূপ অনুভব করিলেন?

৫। অপরাহ্নকালে হ্রদ অঞ্চলের শোভার বর্ণনা দাও।

৬। সরস্বতী-কুণ্ডীর বনে বন্যশিউলির শোভার বর্ণনা দাও।

৭। অর্থ লিখ :— সান্নিধ্য, বনস্পতি, শ্যামলতা, সুদূরবিসর্পী, দিগন্তলীন, বিস্তীর্ণ, উল্লাসভরা, কূজন, শৈলচূড়া।

৮। বাক্য রচনা কর :— নিবিড়, দিগন্তলীন, থোকা থোকা, খররৌদ্র, রৌদ্রদগ্ধ, মচ্‌মচানি, রংবেরঙের, ভ্রূক্ষেপ, নিভৃততর, দুর্গমতর, জড়াজড়ি, সন্ত্রস্তভাবে, সুঘ্রাণ, প্রাচুর্য, ঝির্‌ঝির্।

৯। বানান শিখ :— সরস্বতী, বনস্পতি, নিবিড়, সান্নিধ্য, বহুদূর, স্বচ্ছ, দিগন্তলীন, শৈলশ্রেণী, হৃৎস্পন্দন, বিস্তীর্ণ, ভ্রূক্ষেপ, সুঘ্রাণ, শীর্ষ।

১০। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :— ঘর্মাক্ত, অর্ধচন্দ্রাকারে, সরস্বতী, জলাশয়, বনস্পতি, সমাবেশ, স্বচ্ছ, অর্ধেক।

১১। উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ ভাগ করিয়া দেখাও :—

(ক) একদিন একটা গাছের ডালে উঠিয়া বসিলাম। (খ) সেদিন ফিরিতেছিলাম বেলা ৩টার সময়। (গ) সরস্বতী-কুণ্ডীর বনে পাখির আড্ডা। (ঘ) এইখানেই এদিন প্রথম বন্য হরিণ দেখিলাম। (ঙ) আমি তাহার নাম দিয়াছি ভোম্‌রালতা।

১২। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :— নিবিড়, প্রসারিত, ভিড়, ঘন, ফুলাইয়া, প্রকাণ্ড, স্তব্ধ, সন্ত্রস্তভাবে, শুষ্কপত্র, বিভিন্ন, শীর্ষদেশ, উগ্র।



—ডঃ শিশিরকুমার মিত্র

[জাতীয় অধ্যাপক, বিশ্ববিখ্যাত মহাকাশ-বিজ্ঞানী ডঃ শিশিরকুমার মিত্র অতি সহজ ভাষায় অনেক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। 'রেডিয়াম' কি পদার্থ, ইহার গঠন ও কার্যকারিতা কি, এ সম্বন্ধে লেখক এই প্রবন্ধে অতি সুন্দর ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।]

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানপণ্ডিত ম্যাডাম কুরি রেডিয়াম নামক অপূর্ব ধাতুটির আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারে জগতের বৈজ্ঞানিক সমাজে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। কারণ রেডিয়ামের এমন কতকগুলি অদ্ভুত ও অসাধারণ গুণ আছে, যাহা বৈজ্ঞানিকদের নিকটেও রহস্যময় বলিয়া মনে হইতেছিল।

একথা সকলেই জানেন, কোন বস্তু হইতে অনবরত তেজ বা শক্তি নির্গত হইতে থাকিলে, তাহার শক্তি বা তেজ ক্রমশঃ কমিয়া আসে। একটি উত্তপ্ত দ্রব্য হইতে তাপ নির্গত হইতে থাকিলে তাহা ক্রমশঃ শীতল হইয়া যায়। মানুষ যদি পরিশ্রম করে, তাহা হইলে তাহার দেহের শক্তির পরিমাণ হ্রাস পায় এবং ক্রমশঃ সে ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

রেডিয়ামের তেজ এত বেশি যে এককণা রেডিয়াম তাহার সমান পরিমাণ শীতল জলকে ৪৫ মিনিটের মধ্যে ফুটন্ত অবস্থায় আনিতে পারে। এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন অনবরত সমানভাবে তেজঃস্ফুরণ সত্ত্বেও রেডিয়ামের শক্তির হ্রাস হয় না। রেডিয়ামের সঞ্চিত শক্তি এত বেশি যে, অনবরত শক্তি বিকিরণ সত্ত্বেও তাহার সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ অর্ধেক হইতে প্রায় দেড় হাজার বৎসর লাগে।

রেডিয়াম এই অফুরন্ত তেজ কোথা হইতে পায়? আমরা সাধারণতঃ যে সকল তেজ বা শক্তি লইয়া কারবার করি, সেগুলিকে আমরা পাই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার মিলনে গঠিত। এই কণাগুলিকে অণু বলা হয়। এই অণুকে বিশ্লেষণ করিয়া আমরা যে ক্ষুদ্রতম অংশগুলি পাই—তাহাদিগকে বলে পরমাণু; ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর অণু-পরমাণুর মিলন ঘটিলে রাসায়নিক শক্তির উদ্ভব হয়। কয়লা পুড়াইলে যে তাপ পাই, কেরোসিন জ্বালাইলে যে আলোক পাই, পেট্রোলের সাহায্যে মোটর গাড়ি যে গতি বেগ লাভ করে, আর আহার করিলে আমরা যে শক্তি পাই, ইহাদের সকলেই অণু-পরমাণুর রাসায়নিক মিলনের ফল। ইহাদের মিলনে যখন এত শক্তি পাওয়া যায় তখন এক একটা অণু-পরমাণু যে মহাশক্তির ভাণ্ডার তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

পরমাণুতে যে শক্তি আছে তাহার কতকটা আছে ইহার বহিরাবরণে বা আচ্ছাদনীতে; কতকটা আছে তাহার অভ্যন্তরে। রাসায়নিক মিলনের সময় আমরা যে শক্তির আদানপ্রদান দেখি, তাহা পরমাণুর বহিরাবরণের শক্তিটুকু মাত্র। ঐ শক্তিটুকুর বলে ট্রেন, ট্রাম, মোটর চলিতেছে, বড় বড় কল-কারখানা চলিতেছে এবং প্রাণিগণ আহার করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে।

বহিরাবরণের শক্তির তুলনায় ঢের বেশি শক্তি আছে পরমাণুর অভ্যন্তরে। কিন্তু এ ভীষণ শক্তি পরমাণুর গভীরতম অন্তঃপ্রদেশে এমন ভাবে নিহিত আছে যে, তাহা মানুষের পক্ষে এখনও দুরধিগম্য। মানুষ যদি সে শক্তি কোনদিন অধিগত করিতে পারে—তাহা হইলে সে অসাধ্য সাধন করিবে।

রেডিয়ামের বিশেষত্ব এই যে—ইহার পরমাণুর অভ্যন্তরে যে শক্তির ভাণ্ডার আছে, রেডিয়ামের দুর্ভাগ্যক্রমে কিন্তু মানুষের সৌভাগ্যক্রমে তাহার একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ মুক্ত আছে। গবাক্ষ দ্বার দিয়া রেডিয়ামের বিপুল শক্তির ক্ষুদ্রতর কণাগুলি একটু একটু করিয়া নির্গত হইতেছে। কিন্তু শক্তির পরিমাণের তুলনায় ছিদ্রটি এত ক্ষুদ্র যে, ঐ পথে শক্তি নিঃশেষ হইতে তিন হাজার বৎসর লাগিবে।

রেডিয়ামের শক্তি অলৌকিক বলিয়াই বোধ হয় বিধাতা ইহাকে অতি দুর্লভ করিয়া রাখিয়াছেন। খনিজ পদার্থ হইতে রেডিয়াম সংগ্রহ করিতে এত অধিক ব্যয় হয় যে, এক গ্রাম রেডিয়ামের মূল্য দেড় লক্ষ টাকা। অল্প অল্প রেডিয়াম যাহা আছে, তাহা আছে পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে ও হাসপাতালে। রেডিয়াম হইতে যে তেজ নির্গত হয়, তাহা

ক্যান্সার বা কর্কট রোগের পক্ষে হিতকর। রেডিয়াম ছাড়া এই রোগের অন্য চিকিৎসা নাই। ম্যাডাম্ কুরির এই আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক জগতে যুগান্তর আনিয়াছে।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১। প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :—

(ক) কোন্ বৈজ্ঞানিক রেডিয়াম আবিষ্কার করেন?

(খ) কোন্ বৎসর তিনি ইহা আবিষ্কার করেন?

(গ) তিনি কোন্ দেশের বৈজ্ঞানিক?

(ঘ) রেডিয়াম মানুষের কি উপকার করে?

(ঙ) এক গ্রাম রেডিয়ামের আনুমানিক মূল্য কত?

২। অনবরত তেজঃস্ফুরণ সত্ত্বেও রেডিয়ামের শক্তির হ্রাস হয় না কেন?

৩। 'রেডিয়ামের দুর্ভাগ্যক্রমে কিন্তু মানুষের সৌভাগ্যক্রমে তাহার একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ মুক্ত আছে।' —এই কথার তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) রেডিয়ামের তেজ এত বেশি যে এককণা রেডিয়াম তাহার সমান পরিমাণ শীতল জলকে —— মিনিটের মধ্যে ফুটন্ত অবস্থা আনিতে পারে।

(খ) রেডিয়ামের.........সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ অর্ধেক হইতে প্রায় —— বৎসর লাগে।

(গ) ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর অণুপরমাণুর মিলন ঘটিলে —— শক্তির উদ্ভব হয়।

(ঘ) রেডিয়ামের শক্তি অলৌকিক বলিয়াই বোধ হয় —— ইহাকে অতি —— করিয়া রাখিয়াছেন।

(ঙ) রেডিয়াম হইতে যে তেজ নির্গত হয়, তাহা —— রোগের পক্ষে হিতকর।

৫। শব্দার্থ লিখ :— বিশ্ববরেণ্য; অসাধারণ; রহস্যময়; অনবরত; উত্তপ্ত; নির্গত; তেজঃস্ফুরণ; বহিরাবরণ; অন্তঃপ্রদেশ; অভ্যন্তর; দুরধিগম্য; গবাক্ষ; দুর্লভ; গবেষণাগার; হিতকর; অলৌকিক।

৬। বানান শিখ :— আবিষ্কার; বিশ্ববরেণ্য; অসাধারণ; তেজঃস্ফুরণ, অন্তঃপ্রদেশ; অণু; পরমাণু; ক্রমশঃ; সঞ্চিত, পরিমাণ; সত্ত্বেও; রাসায়নিক; প্রক্রিয়া; প্রাণিগণ; প্রাণধারণ; অন্তঃপ্রদেশ; ভাণ্ডার; দুর্ভাগ্যক্রমে; কণা; গবেষণা; নিঃশেষ।

৭। বাক্য রচনা কর :— বিশ্ববরেণ্য; অনবরত; ক্রমশঃ; সমানভাবে; যাবতীয়; বিকিরণ; অভ্যন্তরে; দুরধিগম্য; আদানপ্রদান; রাসায়নিক; সঞ্চিত; অধিগত; অসাধ্য; বিশেষত্ব; দুর্ভাগ্যক্রমে; সৌভাগ্যক্রমে; অলৌকিক; যুগান্তর।

৮। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :— আবিষ্কার; যুগান্তর; দুরধিগম্য; বহিরাবরণ; আচ্ছাদনী; সঞ্চিত; উত্তপ্ত; অভ্যন্তর; গবাক্ষ; নির্গত; দুর্লভ; গবেষণাগার।

রেডিয়াম এই অফুরন্ত তেজ কোথা হইতে পায়? আমরা সাধারণতঃ যে সকল তেজ বা শক্তি লইয়া কারবার করি, সেগুলিকে আমরা পাই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার মিলনে গঠিত। এই কণাগুলিকে অণু বলা হয়। এই অণুকে বিশ্লেষণ করিয়া আমরা যে ক্ষুদ্রতম অংশগুলি পাই—তাহাদিগকে বলে পরমাণু; ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর অণু-পরমাণুর মিলন ঘটিলে রাসায়নিক শক্তির উদ্ভব হয়। কয়লা পুড়াইলে যে তাপ পাই, কেরোসিন জ্বালাইলে যে আলোক পাই, পেট্রোলের সাহায্যে মোটর গাড়ি যে গতি বেগ লাভ করে, আর আহার করিলে আমরা যে শক্তি পাই, ইহাদের সকলেই অণু-পরমাণুর রাসায়নিক মিলনের ফল। ইহাদের মিলনে যখন এত শক্তি পাওয়া যায় তখন এক একটা অণু-পরমাণু যে মহাশক্তির ভাণ্ডার তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

পরমাণুতে যে শক্তি আছে তাহার কতকটা আছে ইহার বহিরাবরণে বা আচ্ছাদনীতে; কতকটা আছে তাহার অভ্যন্তরে। রাসায়নিক মিলনের সময় আমরা যে শক্তির আদানপ্রদান দেখি, তাহা পরমাণুর বহিরাবরণের শক্তিটুকু মাত্র। ঐ শক্তিটুকুর বলে ট্রেন, ট্রাম, মোটর চলিতেছে, বড় বড় কল-কারখানা চলিতেছে এবং প্রাণিগণ আহার করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে।

বহিরাবরণের শক্তির তুলনায় ঢের বেশি শক্তি আছে পরমাণুর অভ্যন্তরে। কিন্তু এ ভীষণ শক্তি পরমাণুর গভীরতম অন্তঃপ্রদেশে এমন ভাবে নিহিত আছে যে, তাহা মানুষের পক্ষে এখনও দুরধিগম্য। মানুষ যদি সে শক্তি কোনদিন অধিগত করিতে পারে—তাহা হইলে সে অসাধ্য সাধন করিবে।

রেডিয়ামের বিশেষত্ব এই যে—ইহার পরমাণুর অভ্যন্তরে যে শক্তির ভাণ্ডার আছে, রেডিয়ামের দুর্ভাগ্যক্রমে কিন্তু মানুষের সৌভাগ্যক্রমে তাহার একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ মুক্ত আছে। গবাক্ষ দ্বার দিয়া রেডিয়ামের বিপুল শক্তির ক্ষুদ্রতর কণাগুলি একটু একটু করিয়া নির্গত হইতেছে। কিন্তু শক্তির পরিমাণের তুলনায় ছিদ্রটি এত ক্ষুদ্র যে, ঐ পথে শক্তি নিঃশেষ হইতে তিন হাজার বৎসর লাগিবে।

রেডিয়ামের শক্তি অলৌকিক বলিয়াই বোধ হয় বিধাতা ইহাকে অতি দুর্লভ করিয়া রাখিয়াছেন। খনিজ পদার্থ হইতে রেডিয়াম সংগ্রহ করিতে এত অধিক ব্যয় হয় যে, এক গ্রাম রেডিয়ামের মূল্য দেড় লক্ষ টাকা। অল্প অল্প রেডিয়াম যাহা আছে, তাহা আছে পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে ও হাসপাতালে। রেডিয়াম হইতে যে তেজ নির্গত হয়, তাহা

ক্যান্সার বা কর্কট রোগের পক্ষে হিতকর। রেডিয়াম ছাড়া এই রোগের অন্য চিকিৎসা নাই। ম্যাডাম্ কুরির এই আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক জগতে যুগান্তর আনিয়াছে।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১। প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :—

(ক) কোন্ বৈজ্ঞানিক রেডিয়াম আবিষ্কার করেন?

(খ) কোন্ বৎসর তিনি ইহা আবিষ্কার করেন?

(গ) তিনি কোন্ দেশের বৈজ্ঞানিক?

(ঘ) রেডিয়াম মানুষের কি উপকার করে?

(ঙ) এক গ্রাম রেডিয়ামের আনুমানিক মূল্য কত?

২। অনবরত তেজঃস্ফুরণ সত্ত্বেও রেডিয়ামের শক্তির হ্রাস হয় না কেন?

৩। 'রেডিয়ামের দুর্ভাগ্যক্রমে কিন্তু মানুষের সৌভাগ্যক্রমে তাহার একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ মুক্ত আছে।' —এই কথার তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) রেডিয়ামের তেজ এত বেশি যে এককণা রেডিয়াম তাহার সমান পরিমাণ শীতল জলকে —— মিনিটের মধ্যে ফুটন্ত অবস্থা আনিতে পারে।

(খ) রেডিয়ামের.........সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ অর্ধেক হইতে প্রায় —— বৎসর লাগে।

(গ) ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর অণুপরমাণুর মিলন ঘটিলে —— শক্তির উদ্ভব হয়।

(ঘ) রেডিয়ামের শক্তি অলৌকিক বলিয়াই বোধ হয় —— ইহাকে অতি —— করিয়া রাখিয়াছেন।

(ঙ) রেডিয়াম হইতে যে তেজ নির্গত হয়, তাহা —— রোগের পক্ষে হিতকর।

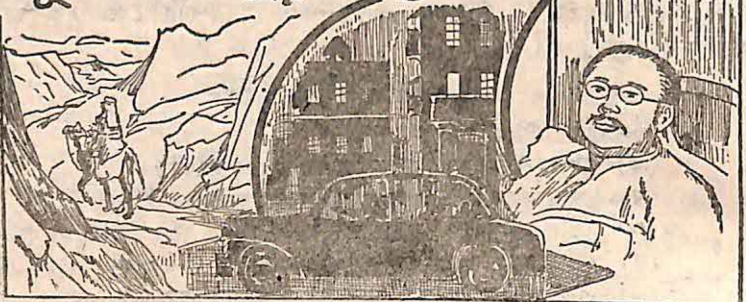
৫। শব্দার্থ লিখ :— বিশ্ববরেণ্য; অসাধারণ; রহস্যময়; অনবরত; উত্তপ্ত; নির্গত; তেজঃস্ফুরণ; বহিরাবরণ; অন্তঃপ্রদেশ; অভ্যন্তর; দুরধিগম্য; গবাক্ষ; দুর্লভ; গবেষণাগার; হিতকর; অলৌকিক।

৬। বানান শিখ :— আবিষ্কার; বিশ্ববরেণ্য; অসাধারণ; তেজঃস্ফুরণ, অন্তঃপ্রদেশ; অণু; পরমাণু; ক্রমশঃ; সঞ্চিত, পরিমাণ; সত্ত্বেও; রাসায়নিক; প্রক্রিয়া; প্রাণিগণ; প্রাণধারণ; অন্তঃপ্রদেশ; ভাণ্ডার; দুর্ভাগ্যক্রমে; কণা; গবেষণা; নিঃশেষ।

৭। বাক্য রচনা কর :— বিশ্ববরেণ্য; অনবরত; ক্রমশঃ; সমানভাবে; যাবতীয়; বিকিরণ; অভ্যন্তরে; দুরধিগম্য; আদানপ্রদান; রাসায়নিক; সঞ্চিত; অধিগত; অসাধ্য; বিশেষত্ব; দুর্ভাগ্যক্রমে; সৌভাগ্যক্রমে; অলৌকিক; যুগান্তর।

৮। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :— আবিষ্কার; যুগান্তর; দুরধিগম্য; বহিরাবরণ; আচ্ছাদনী; সঞ্চিত; উত্তপ্ত; অভ্যন্তর; গবাক্ষ; নির্গত; দুর্লভ; গবেষণাগার।

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান



—শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়

[সুসাহিত্যিক শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় নাটকীয় ভঙ্গীতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্বগৃহ হইতে নাটকীয় অন্তর্ধান, কাবুল গমন ও তথা হইতে জার্মানীতে গমন ও সেখানকার রাষ্ট্রনায়ক হিটলারের সাহায্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার পরিকল্পনার কথা আলোচ্য প্রবন্ধে বলিয়াছেন। সুভাষচন্দ্রের এই দুঃসাহসিক, বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা ভারতবাসী মাত্রকেই স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশের সেবায় উদ্বুদ্ধ করে।]

পালাতে হবে। ছদ্মবেশে ভারতের বাইরে চলে যেতে হবে। জার্মানী, জাপান ও ইটালী ইংরেজের শত্রু। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের সাহায্য নিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে হবে। ইংরেজের যারা শত্রু তারা নিশ্চয়ই পরাধীন ভারতের মিত্র হবে।

সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করবার আয়োজন করতে লাগলেন। কিন্তু কাজটি সোজা নয়। সুভাষচন্দ্রকে ইংরেজের পুলিশ ও গোয়েন্দারা খুব ভালো করেই চেনে। তাঁর মতন সব-চিন জননেতার পক্ষে ছদ্মবেশে ইংরেজ পুলিশ ও গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে ভারতের বাইরে চলে যাওয়া কঠিন —অতীব কঠিন কাজ। এক রকম অসম্ভব কাজই বলা চলে।

সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে উদ্যত হলেন সুভাষচন্দ্র।

সুভাষচন্দ্র বাড়ির বাইরে যাওয়া বন্ধ করলেন। নিজের ঘরটিতে দিনরাত দরজা জানালা বন্ধ করে বসে থাকেন। হরিণের চামড়ার উপরে বসে দিনরাত্রি

গীতা পাঠ করেন। দাড়ি-গোঁফ কামান না। ধ্যান-ধারণা নিয়েই থাকেন। বাড়ির লোকজনের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেন না। মৌন অবলম্বন করেছেন।

বাড়ির বাইরে গোয়েন্দা পুলিশের চরেরা দিনরাত্রি পাহারা দেয়। দিনের পর দিন তাঁরা সংবাদ পেতে লাগলেন সুভাষচন্দ্র গীতা পাঠ করছেন। তাঁরা মুচকে মুচকে হাসেন। বাছাধন রাজনৈতিক পরাজয় ও নৈরাশ্যে অভিভূত হয়ে এখন আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করছেন। খুব খুশি হয়ে ওঠেন গোয়েন্দা কর্তারা। ক্রমশঃ তাঁদের পাহারার কঠোরতাও শিথিল হয়ে আসে।

দিনের পর দিন এমনি করে কাটতে লাগল। সুভাষচন্দ্রের মুখের গোঁফ-দাড়িও বড় হতে লাগল।

জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি। শীতের রাত্রি। কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার। পথে জনমানব নেই। যুদ্ধের জন্য কলকাতায় ব্ল্যাক-আউট। এলগিন রোডে সুভাষচন্দ্রের বাড়ি থেকে গভীর রাত্রে একখানা মোটরকার হেডলাইট নিবিয়ে দিয়ে রওনা হ'ল। এলগিন রোড পার হয়ে চৌরঙ্গীতে পড়ল, চলল হাওড়া স্টেশনের দিকে। হাওড়া ব্রীজ পার হয়ে গেল। গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে গাড়ী চলল বর্ধমানের দিকে। এইবারে গাড়ীর গতি বাড়ল। বর্ধমান ছাড়াল, আসানসোল ছাড়াল। গাড়ী চলেছে নক্ষত্রগতিতে। গাড়ীতে আরোহী সুভাষচন্দ্র, গাড়ীর চালক তাঁরই ভাইপো। রাত্রির অন্ধকারেই তাঁরা বাঙলাদেশের সীমানা পার হয়ে গেলেন।

ভারতবর্ষের সীমানা থেকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে যাত্রা করে আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুল শহরে পেঁছিতে প্রায় এক সপ্তাহ সময় লাগে। পথ বিপদসংকুল। পার্বত্য পাঠানদস্যুরা অনেক সময় রাইফেল নিয়ে যাত্রীদের আক্রমণ করে। লুঠপাট করে নেয় যথাসর্বস্ব। প্রাণেও মেরে ফেলে দরকার হলে। এখানকার লোকেরা পুস্তু ভাষায় কথা বলে।

এখানে এসে উপস্থিত হলেন এক সম্ভ্রান্ত কাবুলি বণিক, কয়েকজন পাঞ্জাবীবন্ধুর সমভিব্যাহারে। নাম তাঁর গীয়াসুদ্দিন আহম্মদ। বড় সুন্দর তাঁর চেহারা—অভিজাত বংশোদ্ভব বটে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে এ-হেন সুন্দর বলিষ্ঠকান্তি অভিজাত ভদ্রলোকটি বোবা এবং কালা। কেবলমাত্র ইশারায় মনের ভাব প্রকাশ করেন। সঙ্গের বন্ধুরাই কথাবার্তা বলে একটি উষ্ট্রপৃষ্ঠে তাঁকে সওয়ার করে দিলেন। গীয়াসুদ্দিন কাবুল যাত্রা করলেন।

হিমালয়ের সানুদেশ দিয়ে প্রসারিত গিরিবর্ত্ম খাইবার পাস। এই পথেই ভারতে প্রবেশ করেছিল যুগে যুগে আক্রমণকারীর দল—চেঙ্গিস্ খাঁ, বাবর, মহম্মদ-বিন্-তুঘলক, আহমেদ শা আবদালি। লুণ্ঠন করেছিল ভারতের সম্পদ, পর্যুদস্ত করেছিল ভারতের স্বাধীনতা। আজ তিন হাজার বছর পরে গীয়াসুদ্দিন বেশী সুভাষচন্দ্র চলেছেন সেই গিরিবর্ত্ম দিয়ে ভারত থেকে বহির্বিশ্বে—ভারতের হৃত স্বাধীনতাকে পুনরুদ্ধার করতে।

গীয়াসুদ্দিন চলেছেন কাবুলের পথে। প্রতি মুহূর্তে ভয় আছে, বিপদ আছে ধরা পড়বার। কেন না সুভাষচন্দ্র পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন, ইংরেজের গোয়েন্দা-পুলিশের ছোট-বড় টিকটিকির ঝাঁক চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাঁকে। ধরা পড়লেই সমস্ত আয়োজন, সব কল্পনা ব্যর্থ।

কয়েক দিন নিরবচ্ছিন্ন উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও অপরিসীম শারীরিক ক্লান্তির ভিতর দিয়ে কেটে গেল। সুভাষচন্দ্র নিরাপদে কাবুল পৌঁছুলেন। কাবুলে তাঁকে উত্তমচাঁদ নামক এক ভারতীয় ব্যবসায়ী সাদরে গ্রহণ করে আশ্রয় দিলেন। উত্তমচাঁদের গৃহে সুভাষচন্দ্র আত্মগোপন করে বাস করতে লাগলেন এবং সেখান থেকে গোপনে জার্মানী যাবার পরিকল্পনা করতে লাগলেন।

সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্যস্থল বার্লিন। সেখানে গিয়ে তিনি হিটলারের সঙ্গে মিলিত হতে চান। হিটলারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জার্মানীর সামরিক শক্তির সহযোগিতা লাভ করতে পারলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য এক অভিনব সংগ্রাম-অভিযান গড়ে তুলবেন, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন।

অবশেষে বার্লিনে এসে উপস্থিত হলেন সুভাষচন্দ্র। হিটলার তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং নিজের সমকক্ষ মর্যাদা দিলেন। হিটলার সুভাষচন্দ্রকে জার্মানীর সমরনেতাদের নিকট 'ইণ্ডিয়ান ফুরার' বলে পরিচয় দিলেন।

এতদিনে সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন সার্থক হ'ল। তিনি চেয়েছিলেন যুদ্ধের সময়ে ইংরেজ যখন সবচেয়ে বিপন্ন হয়ে পড়বে সেই সময়ে ইংরেজের বৈরীরাষ্ট্রের সহযোগিতায় ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করতে। এতদিনে তিনি তাঁর বাঞ্ছিত যোগাযোগ স্থাপনে সমর্থ হলেন।

বার্লিন রেডিও থেকে সুভাষচন্দ্র দিনের পর দিন ভারতে গণ-বিপ্লবের প্রেরণা দিয়ে বক্তৃতা করতে লাগলেন ঃ

"আজ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সবচেয়ে বড় সুযোগ এসেছে।

ইংরেজের বিপদই ভারতের সুযোগ। ইংরেজের সমস্ত শক্তি এখন ভারতের বাইরে যুদ্ধে ব্যস্ত রয়েছে। ভারতবর্ষে এখন যদি বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুত্থান হয় তা হলে ইংরেজ তাকে দমন করতে পারবে না।"

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১। সুভাষচন্দ্র কিভাবে ছদ্মবেশে স্বগৃহ হইতে পুলিশের চোখে ধূলি দিয়া পলায়ন করিলেন?

২। সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের সীমানা হইতে কিভাবে কাবুল শহরে পৌঁছিলেন?

৩। সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্যস্থল বার্লিন ছিল কেন? তিনি সেখানে কাহার সহিত, কি উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করিলেন?

৪। বার্লিন হইতে তিনি কিভাবে ভারতবাসীদিগকে গণবিপ্লবের প্রেরণা দিতেন?

৫। শব্দার্থ লিখ ঃ— ছদ্মবেশ, উদ্যত, নৈরাশ্য, আধ্যাত্মিক, শিথিল, পার্বত্য, বিপদ্‌সংকুল, বলিষ্ঠকান্তি, অভিজাত, গিরিবর্ত্ম, পর্যুদস্ত, অপরিসীম, আত্মগোপন, বৈরীরাষ্ট্র, অভ্যুত্থান।

৬। বাক্য রচনা কর ঃ— ছদ্মবেশে, চোখে ধূলি দেওয়া, কথাবার্তা, শিথিল, পার্বত্য, বিপদ্‌সংকুল, ইশারা, অভিজাত, নিরবচ্ছিন্ন, অপরিসীম, নিরুদ্দেশ, সহযোগিতা, সার্থক, বিপন্ন, অভ্যুত্থান, বৈপ্লবিক।

৭। বানান শিখ ঃ— সান্ত্বনা, ক্রমশঃ, আধ্যাত্মিক, নৈরাশ্য, অভিভূত, খুশি, উষ্ট্রপৃষ্ঠে, যথাসর্বস্ব, আক্রমণ, গিরিবর্ত্ম, পর্যুদস্ত, মুহূর্ত, ব্যস্ত, স্বপ্ন, লক্ষ্যস্থল অপরিসীম, শারীরিক, অভ্যুত্থান, প্রেরণা।

৮। সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ— নিশ্চয়, আধ্যাত্মিক, বহির্বিশ্ব, নিরুদ্দেশ, নিরবচ্ছিন্ন, নিরাপদ, অভ্যুত্থান।

৯। টীকা লিখ ঃ—গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড্‌, ব্ল্যাক আউট, পার্বত্য পাঠান দস্যু, উত্তমচাঁদ, ইন্ডিয়ান ফ্যুরার, গোয়েন্দা পুলিশ।

১০। "তোমার প্রিয় নেতা" এই বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর।

বঙ্গভঙ্গে জাতীয়তার জয়ধ্বনি

—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

[পরিচিতি। বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'কংগ্রেসের ইতিহাস' পুস্তক হইতে এই অংশ সংকলিত হইয়াছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া যে জাতীয় ভাবের উদ্বোধন হইয়াছিল এখানে তাহাই আলোচিত হইয়াছে।]

বাঙ্গালায় বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্য করিয়া তুমুল আন্দোলনের উদ্ভব হয়। শাসনের সুবিধা হইবে এই কারণ দেখাইয়া লর্ড কার্জনের সরকার বাঙ্গালার পশ্চিম ভাগ বিহার ও উড়িষ্যার সহিত এক প্রদেশে এবং পূর্ববঙ্গ আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া আর এক প্রদেশে পরিণত করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছিলেন। ইহার ফলে—বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর সংখ্যাই অল্প হইত—বিহারী, উড়িয়া, বাঙ্গালী—কেহই নেতৃস্থানীয় হইতে পারিতেন না। লর্ড কার্জনের মত দাম্ভিক লোক সচরাচর দৃষ্ট হয় না। একে দাম্ভিক লোক, প্রতিবাদ সহিতে পারে না, তাহাতে আবার লর্ড কার্জনের মনীষা সুপ্রযুক্ত না হইয়া অপপ্রয়োগই যেন ভালবাসিত। বাঙ্গালায় দেশাত্মবোধ-বিকাশ-ফলে যে স্বাবলম্বনের ভাব প্রবল হইয়াছিল, তাহা আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় ছিল। বঙ্গভঙ্গের প্রভাবে সে সুযোগ ঘটিল। বাঙ্গালী এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে জাতীয়তার জয়ধ্বনি করিল—সে জয়ধ্বনি সিন্ধুগর্জনের মত শ্রুত হইল এবং দিকে দিকে লোককে আকৃষ্ট করিল। লর্ড কার্জন বিচলিত হইলেন। তিনি স্বয়ং পূর্ববঙ্গে যাইয়া মুসলমানদিগকে আশ্বাস দিলেন পূর্ববঙ্গ যে স্বতন্ত্র প্রদেশ হইবে, তাহাতে মুসলমানেরই প্রাধান্য হইবে। লর্ড কার্জন প্রাচ্যজাতি সকলকে অসত্যপ্রবণ বলিলে—তাঁহারই রচনা হইতে তাঁহার মিথ্যানুরাগ প্রতিপন্ন করা হইল।

বাঙ্গালা তখন যে নূতন রূপে দেখা দিল, তাহা রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করিয়াছেন :—

আজি বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হ'লে জননী!
ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট-নেত্র আগুন-বরণ।

বাঙ্গালীর এই আন্দোলন ভাবে যেমন—পদ্ধতিতেও তেমনিই সর্বতো-ভাবে জাতীয়। হেমচন্দ্র ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসে "রাখী-বন্ধন" কল্পনা করিয়াছিলেন—আজ দুর্দিন, সরকার যখন বাঙ্গালাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে উদ্যত তখন বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে ভাই বলিয়া পরস্পরের মণিবন্ধে রাখী বাঁধিয়া কার্জনের সরকারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। রাখী বন্ধনের মন্ত্র—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।

জুলাই মাসে সংবাদ পাওয়া গেল, ভারত-সচিব বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। ৭ই আগষ্ট কলিকাতায় এক বিরাট সভায় বিলাতী পণ্য বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইল। নূতন অস্ত্র লইয়া বাঙ্গালী রাজনীতিক রণাঙ্গনে প্রবেশ করিল। ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ হইল। সে দিন সমগ্র বাঙ্গালায় অরন্ধন—দোকান-পাট বন্ধ, কলিকাতার বাজারে খাদ্য-দ্রব্যও বিক্রীত হইল না! আনন্দমোহন বসুকে রোগশয্যা হইতে বহন করিয়া আনিয়া মিলনমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করান হইল। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলিলেন—"সেকালে কোন দেবানুগ্রহ-ধন্য ঋষি বলিয়াছিলেন, তিনি গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব দেখিয়াছেন, তাহাতেই তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন। আমি তাঁহার পদধূলি গ্রহণের যোগ্য নহি। কিন্তু আমি যে এই নূতন জাতীয় জীবনের আবির্ভাব দেখিলাম, ইহাতে আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।"

একদিকে সরকার যেমন লোকের মত পদদলিত করিয়া বঙ্গবিভাগ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, অপর দিকে দেশের লোক তেমনিই স্থির করিল, এই দম্ভজনিত ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতেই হইবে। তাই যখন নিম্নলিখিত ইস্তাহার সভায় পঠিত হইল তখন মধ্যপন্থী ও জাতীয় দল সকলেই ইহার সমর্থন করিলেন :—

'গভর্নমেণ্ট সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রতিবাদ সত্ত্বেও যখন বঙ্গবিভাগ করা সঙ্গত মনে করিয়াছেন, তখন আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি ও ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা আমাদিগের প্রদেশ বিভাগের কুফল নষ্ট করিতে ও জাতির একত্ব

রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। (এ কার্যে) ভগবান আমাদিগের সহায় হউন।'

সরকারী কর্মচারীরা যেমন মনে করিতে লাগিলেন চণ্ড নীতির দ্বারা লোকের আপত্তি চূর্ণ করিবেন, লোকের সঙ্কল্প তেমনই দৃঢ় হইতে লাগিল।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ একটি গানে সেই ভাবটি ব্যক্ত করিয়াছেন—

"আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবি, আমি কি মা'র সেই ছেলে?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি, কে পালাবে মা ফেলে?"

মানুষের মনে যে শক্তি অজেয়, তাহার কথা যেন এ সব রাজপুরুষ ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

অসহযোগ তখন এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, ছাত্রদিগকে সভাসমিতিতে যোগদানে বিরত থাকিবার জন্য সরকারের আদেশ প্রচার সত্ত্বেও ছাত্ররা দলে দলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিতে লাগিল।

বাঙ্গালী ভয় ভুলিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করিলেন :—

"আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দু'বেলা—মরার আগে
মরব না, ভাই মরব না।"

বাস্তবিক এই আন্দোলন যে বাঙ্গালীর অন্তর হইতে উদ্গত ভাবের অভিব্যক্তি—কেবল বঙ্গ বিভাগের প্রতিবাদ নহে—তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কবি, বক্তা ও সাহিত্যিক সে সময় যে সব রচনায় বাঙ্গালীর মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সে সব রচনা জাতীয় ভাবের প্রবল প্রেরণা ব্যতীত রচিত হইতে পারে না।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাটি কি রকম ছিল? বঙ্গভঙ্গের প্রভাবে বাঙালার জাতীয়ভাবের উদ্বোধনের কিভাবে সুযোগ ঘটিল?

২। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে ব্যর্থ করিবার জন্য বাঙ্গালী কিভাবে প্রতিবাদ করিয়াছিল তাহার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। এই আন্দোলন যে বাঙ্গালীর অন্তর হইতে উদ্গত ভাবের অভিব্যক্তি তাহা কিভাবে বুঝা যায়?

৩। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা আলোচনা কর।

৪। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের প্রতিবাদে বাঙ্গালীর বিলাতী পণ্যবর্জন, অরন্ধন ও রাখীবন্ধনের তাৎপর্য কি?

৫। আনন্দমোহন বসু কে ছিলেন? তিনি বাঙ্গালীর মিলন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনে যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম কি? এই মিলন মন্দিরের সভায় যে ইস্তাহার পঠিত হইয়াছিল তাহার সারমর্ম কি?

৬। "দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি"—এই গানের পংক্তিটি কাহার রচনা? ইহার মধ্যে কোন ভাব ব্যক্ত হইয়াছে?

৭। "মানুষের মনে যে শক্তি অজেয়..................ভুলিয়া গিয়াছিলেন।"—এই কথার তাৎপর্য কি?

৮। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ছাত্রদিগকে কিভাবে প্রভাবিত করিল?

৯। টীকা লিখ :— মিলন মন্দির, রাখীবন্ধন, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, অসহযোগ আন্দোলন, হেমচন্দ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়)।

১০। শব্দার্থ লিখ ও বাক্য রচনা কর :—

কৃতসঙ্কল্প, নেতৃস্থানীয়, সচরাচর, মনীষা, দেশাত্মবোধ, স্বাবলম্বন, আত্মপ্রকাশ, অসত্যপ্রবণ, স্বতন্ত্র, মিথ্যানুরাগ, শঙ্কা, অপরূপ, ললাট-নেত্র, সর্বতোভাবে, মণিবন্ধ, পদদলিত, অক্ষুণ্ণ, যথাসাধ্য, রক্তারক্তি, ব্যর্থকাম, উদ্গত, অভিব্যক্তি।

১১। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :— মনীষা, দেশাত্মবোধ, মিথ্যানুরাগ, রবীন্দ্রনাথ, সর্বতোভাবে, দুর্দিন, পরস্পর, কৃতার্থ, উদ্গত, ব্যতীত।

দক্ষিণ মেরু অভিযান



—শশাঙ্কশেখর বাগচি

[বিখ্যাত প্রাবন্ধিক শশাঙ্কশেখর বাগচি 'দক্ষিণ মেরু অভিযান প্রবন্ধে মেরুবীর কাপ্তেন স্কটের বীরত্বপূর্ণ অভিযানের কথা বলিয়াছেন।]

পৃথিবীর উত্তর সীমায় উত্তর-মেরু ও দক্ষিণ সীমায় দক্ষিণ-মেরু। মেরুতে সর্বদাই অত্যন্ত শীত—সমস্ত বৎসর ধরিয়া সহস্র সহস্র ক্রোশ জুড়িয়া কেবল বরফ জমিয়া আছে। একসঙ্গে দুইমাস হয়ত সূর্যের আলো দেখাই পাওয়া গেল না, যখন সূর্য দেখা গেল তখনও সূর্যের আলো বড়ই ক্ষীণ, উত্তাপ বড়ই মৃদু। সীল, পেঙ্গুয়িন প্রভৃতি কয়েকটি প্রাণী ছাড়া সেখানে এত শীতে আর কোনও জীবজন্তু বাস করিতে পারে না। গাছপালা প্রভৃতি কোনও উদ্ভিদ সেখানে জন্মিতে পারে না। মেরুতে প্রায়ই ঝড় হয়—তাহাকে তুষার-ঝটিকা বলে। সে অতি ভীষণ ব্যাপার। তীব্রভাবে বাতাস বহিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাত হইতে থাকে। এই ঝড়ের মুখে পড়িলে আর রক্ষা নাই। শীতের বাতাসে, তুষারের স্পর্শে হাত-পা অসাড় হইয়া যায়, দেহের রক্ত-চলাচল বন্ধ হইয়া হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থামিয়া যায়।

কাপ্তেন স্কট্ নামে একজন সাহসী ইংরেজ দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কার করিবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। মেরুর প্রান্তে উপস্থিত হইয়া ফিরিবার পথে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-মেরু সম্বন্ধে সংবাদ-সংগ্রহের জন্য দক্ষিণ-

মেরুতে একদল লোক পাঠান হইবে স্থির করা হইল। কাপ্তেন স্কট্ তখন নৌবিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী। তাঁহাকে এই অভিযানের দলপতি নিযুক্ত করা হইল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি তিনি সদলবলে জাহাজে চড়িয়া দক্ষিণ-মেরুর দিকে যাত্রা করিলেন। দক্ষিণ-মেরু হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ইংলণ্ডে আসিলেন। সেবার মেরুর প্রান্ত ৫০০ মাইলও ব্যবধানে ছিল না। তাঁহার পূর্বে কেহই আর এতদূর যাইতে পারে নাই। মেরুভ্রমণ করিবার পর ফিরিয়া আসিয়া তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে লোকে অনেক অনেক নূতন সংবাদ জানিতে পারিল। পূর্বে লোকের ধারণা ছিল যে, দক্ষিণ-মেরুও উত্তর-মেরুর ন্যায় একটি মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু স্কট্ ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, দক্ষিণ-মেরুর দিকে একটি প্রকাণ্ড মহাদেশ রহিয়াছে। সেই বিস্তীর্ণ মহাদেশের উপর দশ-পনর হাজার ফুট উচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী পর পর চলিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে বরফের নদী বহিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে চিরতুষারে আবৃত উপত্যকা। পর্বতশৃঙ্গ, নদী, উপত্যকা সমস্তই বরফে আচ্ছন্ন। এই পথে চলিতে চলিতে তিনি অনেকবার অনেক বিপদে পড়িয়াছিলেন। একবার এক পাহাড়ের উপর হইতে স্কট্ দুইজন সঙ্গী লইয়া বরফের নদী দিয়া নিচে নামিতেছিলেন। তাঁহাদের তিনজনের কোমরে শক্ত দড়ি ছিল—দড়ির অপর প্রান্ত একখানা শ্লেজের সঙ্গে বাঁধা ছিল। স্কট্ ও তাঁহার একটি সঙ্গী একটু আগে আগে চলিতেছিলেন। চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা ফাটলের মধ্যে তাঁহারা পড়িয়া গেলেন। ফাটলের মুখ বরফে ঢাকা ছিল বলিয়া তাঁহারা পূর্বে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। দড়িতে টান পড়িতেই পিছনের শ্লেজখানি ফাটলের মুখে আসিয়া আটকাইয়া গেল। তখন দড়ি বাহিয়া তাঁহারা অতি কষ্টে উপরে উঠিয়া আসিলেন। শ্লেজখানি ঐভাবে ফাটলের মুখে বাধিয়া গিয়াছিল বলিয়াই ইঁহাদের জীবনরক্ষা হইল। মেরুযাত্রীর জীবনে এইরূপ বিপদ প্রায়ই ঘটে, মৃত্যু ইঁহাদের নিত্য-সহচর।

কাপ্তেন স্কট্ ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলে সকলেই তাঁহার কার্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পদোন্নতি হইল। একদিন ইংলণ্ডের লোকে শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল যে কাপ্তেন স্কট্ তাঁহার এত বড় চাকুরি ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি দক্ষিণ-মেরু অভিযানের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইল—নানারূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, ঔষধ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যে জাহাজ পূর্ণ হইল। কয়েকজন অসীম-

সাহসী সহচরসহ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন কাপ্তেন স্কট্ সমস্ত দেশবাসীর আশীর্বাদ মাথায় লইয়া যাত্রা করিলেন।

সাত মাস সমুদ্রের উপর দিয়া জাহাজ চলিল। তারপর আর জাহাজে অগ্রসর হওয়া যায় না—বড় বড় বরফের স্তূপ জাহাজের গতিরোধ করিল। স্কট্ তখন সদলবলে জাহাজ ছাড়িয়া নামিয়া পড়িলেন। তাঁহারা কখনও কঠিন বরফের উপর দিয়া, কখনও পাহাড়ের গা বাহিয়া, কখনও শ্লেজে, কখনও পদব্রজে, ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন।

প্রায় এক বৎসর ধরিয়া তাঁহারা ধীরে ধীরে মেরুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তাঁহারা একটি পর্বতের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিলেন। সেখান হইতে তাঁহাদের গন্তব্য স্থান ১৭০ মাইল। এই অবশিষ্ট পথ অতি ভয়ংকর। শীতের তীব্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং ঐ পর্বতের উপর তিনি শিবির স্থাপন করিলেন। চারিজন সংগী লইয়া তিনি যাত্রা করিলেন। অবশিষ্ট সঙ্গিগণকে ঐ শিবিরে তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া গেলেন। একমাসের মধ্যেই তাঁহারা মেরু প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আসিবেন।

১৮ই জানুয়ারি তাঁহারা মেরুপ্রান্তে উপনীত হইলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিলেন যে সেই জনশূন্য প্রান্তরে নরওয়ে দেশের জাতীয় পতাকা উড়িতেছে। এমাণ্ডসন নামে নরওয়ের একজন সাহসী যুবক দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়া একমাস পূর্বে এই স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার পরিত্যক্ত শিবির তখনও দাঁড়াইয়া আছে, এবং শিবিরের মধ্যে অনেক কাগজপত্র পড়িয়া আছে।

স্কট ফিরিয়া চলিলেন। এইবার অদৃষ্ট তাঁহার প্রতিকূল হইয়া উঠিল। তাঁহার সঙ্গিগণ ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তিনি সর্বদা তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। একদিন হঠাৎ তাঁহার একটি সংগী পড়িয়া গেল। তাহার মাথায় খুব আঘাত লাগিল। সেই আঘাতের ফলেই তাহার মৃত্যু ঘটিল। কয়েকদিন চলার পর হঠাৎ বাতাসের বেগ বাড়িয়া গেল, অত্যন্ত শীতও পড়িল। আর অগ্রসর হওয়া যায় না, প্রতি পদক্ষেপ কষ্টকর মনে হইতে লাগিল। বায়ুর বেগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—মনে হইল বাতাস বুঝি গায়ের মাংস কাটিয়া লইয়া যাইতেছে! এই অবস্থায় স্কট্ আরও একটি সংগী হারাইলেন! দুর্যোগ ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে, শরীরও ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছে,—তবুও তাঁহারা চলিতেছেন। সঙ্গে যে খাদ্য ছিল, তাহা নিঃশেষ,

আর এগার মাইল পথ চলিতে পারিলেই তাঁহারা শিবিরে পৌঁছিতে পারেন—সেই শিবিরে অবশিষ্ট সঙ্গীরা তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে—সেখানে খাদ্য, ঔষধ, বস্ত্র, কোনও জিনিসের অভাব নাই। দুর্গম পথে সহস্র মাইল তাঁহারা অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু এই এগার মাইল পথ আর শেষ হইল না! ভয়ানক ঝড় উঠিল, ঝড় থামিল না—দিবারাত্র সমানভাবে তুষার-ঝটিকা বহিতে লাগিল। খাদ্য ফুরাইয়া গিয়াছে, পোশাক-পরিচ্ছদ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, দুর্বল দেহ লইয়া এই অবস্থায় আর কতদিন মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে? স্কটের সঙ্গী দুইজন আর সহ্য করিতে পারিল না। স্কট্ যখন বুঝিলেন যে, জীবনরক্ষা করা অসম্ভব, তখন দেশবাসীকে উদ্দেশ করিয়া তিনি কাগজে লিখিলেন, "একমাস আমরা যে কষ্ট পাইলাম, কোন মানুষ বোধহয় তত কষ্ট পায় নাই। দুঃখ নাই—ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। যদি বাঁচিতাম, তাহা হইলে আমার সঙ্গীদের বীরত্ব ও সাহসের কথা দেশবাসীকে শুনাইতে পারিতাম।"

কাপ্তেন স্কটের সন্ধানে যাহারা বাহির হইয়াছিল, তাহারা তাঁহার মৃত্যুর আট মাস পরে এই চিঠি ও তাঁহার মৃতদেহ কুড়াইয়া পাইয়াছিল।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

মৃত্যুঞ্জয় স্কট মেরু রহস্যের সন্ধানে জীবন উৎসর্গ করিয়া মানুষের মধ্যে ভাগবত রহস্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ডের লোকেরা তাঁর স্মৃতির সম্মানে একটি মেরু মিউজিয়াম গড়িয়া তুলিয়াছেন। মহৎ মৃত্যু চিরকাল মানুষকে পরমতম গৌরব দান করিয়াছে। স্কট তাহার দৃষ্টান্ত।

১। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর প্রাকৃতিক চিত্র বর্ণনা কর।

২। কাপ্তেন স্কট প্রথম জীবনে কি কাজ করিতেন? তিনি দক্ষিণ মেরু অভিযানের দলপতি হইয়া সর্বপ্রথম কবে দক্ষিণ মেরু অভিযান করিয়াছিলেন? তাহার ফল কি হইয়াছিল?

৩। স্কট দ্বিতীয়বার কবে দক্ষিণ মেরু অভিযানে অগ্রসর হইলেন? তাঁহার পূর্বে দক্ষিণ মেরু প্রান্তে কে পৌঁছাইয়াছিলেন?

৪। কাপ্তেন স্কটের শেষবারের দক্ষিণ-মেরু অভিযানের বর্ণনা দাও। তিনি মৃত্যুকালে দেশবাসীকে উদ্দেশ করিয়া কি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন? তাঁহার এই লেখা কিভাবে পাওয়া গেল?

৫। অনুক্তস্থান পূর্ণ কর :—

কাপ্তেন স্কট ছিলেন——একজন পদস্থ কর্মচারী। পূর্বে লোকের ধারণা ছিল যে, দক্ষিণ-মেরুও উত্তর-মেরুর ন্যায় একটি—মধ্যে অবস্থিত। স্কট বলিলেন যে দক্ষিণ-মেরুর দিকে একটি প্রকাণ্ড——রহিয়াছে। সেখানে পর্বতশৃঙ্গ নদী উপত্যকা সবই——আচ্ছন্ন। কয়েকজন অসীম সাহসী সহচরসহ——খ্রীষ্টাব্দের——জুন কাপ্তেন স্কট সমস্ত দেশবাসীর ——মাথায় লইয়া যাত্রা করিলেন।

৬। শব্দার্থ লিখ :— বিস্তীর্ণ, অবসন্ন, অসাড়, ব্যবধান, প্রতিকূল।

৭। বাক্য রচনা কর :— তুষারপাত, তীব্রভাবে, নিত্যসহচর, চিরতুষার, সংগৃহীত, পদব্রজে, সদলবলে, পরিত্যক্ত, প্রয়োজনীয়, পদক্ষেপ।

৮। বানান শিখ :— নিঃশেষ, বিস্তীর্ণ, উপনীত, পরিত্যক্ত, প্রতিকূল, দেশবাসী, আশ্চর্য, প্রয়োজনীয়, পদক্ষেপ, সংগৃহীত।

৯। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :— আবিষ্কার, আচ্ছন্ন, সংবাদ, পদোন্নতি, পরিচ্ছদ।

১০। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :— দুর্গম, সাহসী, প্রশংসা, আশীর্বাদ, দুঃখ, তীব্রতা, উৎসাহ, প্রতিকূল, মৃত্যু।

১১। লিঙ্গ পরিবর্তন কর :— যুবক, সহচর, পক্ষী, মানুষ, ভগবান।

১২। টীকা লিখ :— শ্লেজ, এমাণ্ডসন, তুষারঝড়।

পদ্যাংশ



আত্মত্রাণ

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কবি ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন যে দুঃখ, বিপদ ও ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাইতে তিনি চাহেন না, বরং ঈশ্বর কবিকে এরূপ শক্তি দিন, যাহাতে কবি স্বাবলম্বী হইয়া বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পারেন। ইহা হইতে তিনি ত্রাণ বা অব্যাহতি চাহেন না। সুখ-দুঃখ সব অবস্থায় তিনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিমান থাকিতে চাহেন।]

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে-ব্যথিত চিতে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়!
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে—
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়॥

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা—
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্রশিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে—
দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা,
তোমারে যেন না করি সংশয়॥

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১। কবিতাটি মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি কর।

২। এই কবিতায় আত্মসমর্পিত অথচ আত্মনির্ভর, বলিষ্ঠ বীর-ভক্তের প্রার্থনার ভাবটি বুঝাইয়া দাও।

৩। "নম্র শিরে সুখের দিনে............না করি সংশয়'—ঈশ্বর যে সুখ-দুঃখ ভাবের অতীত, আমাদের সত্তার চিরসংগী—এই ভাবটি এই পংক্তি কয়টির মধ্যে কিভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে বুঝাইয়া দাও।

৪। 'তরিতে পারি' ও 'বহিতে পারি' পংক্তি অংশে কবি কি 'তরিতে' ও কি 'বহিতে' চাহেন?

৫। কবি এই কবিতায় 'আমি' ও 'নিজ' কথা দুটি বারে বারে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে কি কবির কোন অহংকার প্রকাশ পাইয়াছে?

৬। এই কবিতার মূল বক্তব্য সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা কর।

৭। অর্থ লিখ ঃ— দুঃখতাপে, সহায়, বঞ্চনা, ত্রাণ, লাঘব, নম্রশিরে, নিখিল-ধরা, সংশয়।

৮। বানান কয়টি ভুল করিও না ঃ—
সান্ত্বনা, ক্ষতি, বঞ্চনা, দুঃখ, সংশয়, ত্রাণ, ক্ষয়।

৯। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ ঃ— লাঘব, সান্ত্বনা, দুঃখ, ত্রাণ, সংশয়।

১০। কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ—
বিপদে মোরে রক্ষা করো। দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে। দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।



জটায়ুর আত্মোৎসর্গ

—কৃত্তিবাস ওঝা

[পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কবি কৃত্তিবাস ওঝার (উপাধ্যায়) আবির্ভাব। তিনি বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম রামায়ণ রচনা করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সহিত পরিচয় নাই এমন বাঙালী কমই আছেন। তাঁহার লেখা 'রামায়ণ' মহাকাব্য হইতে 'জটায়ুর আত্মোৎসর্গ' অংশটি লওয়া হইয়াছে।]

পাখসাট মারে পক্ষী আর দেয় গালি।
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে মহাবলী॥
আকাশে উঠিয়া দেখে রাম বহু দূর।
আঁচড়ে কামড়ে তার রথ হৈল চূর॥
ছিঁড়িল ঠোঁটের ঘায় সারথির মুণ্ড।
রথধ্বজ ভাঙিয়া করিল খণ্ড খণ্ড॥
ব্যতিব্যস্ত দশানন জ্বলে ক্রোধানলে।
রথ হৈতে সীতারে রাখিল ভূমিতলে॥
পলাইতে চান সীতা নাহি পান পথ।
চতুর্দিকে মহাবন-বেষ্টিত পর্বত॥
ভয়েতে কাঁদেন সীতা করিয়া ব্যগ্রতা।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা॥
যুঝে পক্ষিরাজ কিন্তু অন্তরেতে ত্রাস!
বৃক্ষ ডালে বৈসে তার ঘন বহে শ্বাস॥

আরবার জটায়ু সাহসে করি ভর।
মহাযুদ্ধ করে পক্ষী অতি ঘোরতর॥
রাবণের মুকুট যে রত্নেতে নির্মাণ।
ঠোঁট দিয়া পক্ষী তাহা করে খান খান॥
দুর্জয় রাবণ রাজা ত্রিভুবন জিনে।
কি করিতে পারে তার পক্ষীর পরাণে॥
রাবণ দেখিল পক্ষী বলে নাহি টুটে।
অর্ধচন্দ্র বাণে তার দুই পাখা কাটে॥
ভূমেতে পড়িয়া পক্ষী করে ছটফট।
আসিয়া কহেন সীতা পক্ষীর নিকট॥
আমা লাগি হে শ্বশুর হারালে জীবন।
রাবণের হাতে আছে আমার মরণ॥
প্রভুরে দেখহ যদি বনের ভিতর।
বলিও তোমার সীতা হরে লঙ্কেশ্বর॥
জটায়ু বলেন, দেবি নাহি মোর হাত।
যত যুদ্ধ করিলাম দেখিলে সাক্ষাৎ॥
আমার বচন শুন করো না ক্রন্দন।
তোমারে উদ্ধারিবেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

'জটায়ু' পাখী হইলেও রাজা দশরথের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও রাজপরিবারের সকলের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। রাজকুলবধূ সীতা তাহার পুত্রবধূতুল্যা। রাবণ সীতাকে হরণ করিবার সময় জটায়ু সর্বশক্তি দিয়া রাবণকে বাধা দেয়, কিন্তু রাবণের অমিত শক্তি তাহাকে পরাভূত করে। জটায়ুর এই আত্মোৎসর্গ তাহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

গদ্যরূপ :— চূর—চূর্ণ। যুঝে—যুদ্ধ করে। বৈসে—বসিয়া। জিনে—জয় করে। পরাণে—প্রাণে। দেখহ—দেখ। উদ্ধারিবেন—উদ্ধার করিবেন।

১। জটায়ু যে 'মহাবলী' এই কবিতায় তার কি পরিচয় পাওয়া যায়?
২। রাবণ শেষপর্যন্ত কিভাবে জটায়ুকে পর্যুদস্ত করে?
৩। সীতা জটায়ুকে 'শ্বশুর' সম্বোধন করিলেন কেন?
৪। জটায়ু সীতাকে কিভাবে সান্ত্বনা দিলেন?

৫। জটায়ু ও সীতার কথোপকথনের সারাংশ লিখ।

৬। জটায়ুর আত্মোৎসর্গের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৭। কবিতাটির সরল গদ্যান্তর কর।

৮। এই কবিতার আর একটি উপযুক্ত 'নামকরণ' কি হইতে পারে? তোমার দেওয়া নামকরণের সার্থকতা দেখাও।

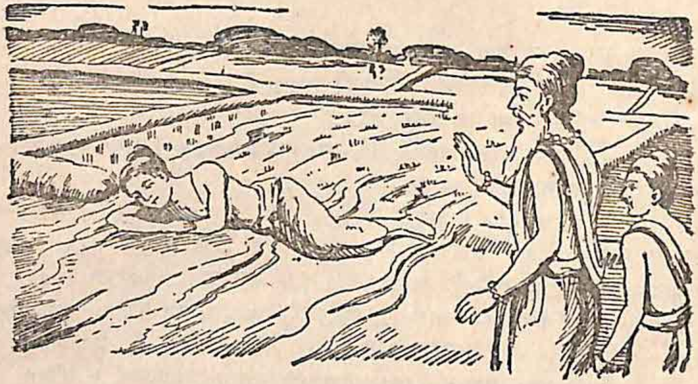
৯। (ক) অন্তরীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা। (খ) যুঝে পক্ষিরাজ কিন্তু অন্তরেতে ত্রাস। (গ) জটায়ু বলেন দেবি নাহি মোর হাত। (ঘ) তোমারে উদ্ধারিবেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ—এই পংক্তিগুলির অর্থ ভালভাবে বুঝাইয়া দাও।

১০। শব্দার্থ লিখ :— পাখসাট, মহাবলী, রথধ্বজ, অন্তরীক্ষে, ত্রাস, ত্রিভুবন, টুটে।

১১। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :— ক্রোধানলে, লঙ্কেশ্বর, চতুর্দিকে, দুর্জয়।

১২। বাক্য রচনা কর :— হাহাকার, মহাবলী, ব্যতিব্যস্ত, ব্যগ্রতা, অন্তরীক্ষে, খানখান, ত্রিভুবন, ছটফট।

১৩। বানান অনুশীলন কর :— মরণ, সাক্ষাৎ, ত্রিভুবন, অন্তরীক্ষ, ক্রন্দন, রাবণ, রথধ্বজ, ব্যতিব্যস্ত, ব্যগ্রতা, শ্বাস, নির্মাণ, পরাণ, লক্ষ্মণ।



আরুণি

—কাশীরাম দাস

[বাংলা মহাভারতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি কাশীরাম দাস। তাঁহার বাড়ী ছিল বর্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রামে। কাশীদাসী মহাভারত বাঙ্গালীর অত্যন্ত প্রিয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি সংস্কৃতে লেখা মূল মহাভারত হইতে বাংলায় মহাভারত অনুবাদ করেন।]

আরুণি নামেতে ছিল শিষ্য একজন
ডাকি তারে গুরু আজ্ঞা করেন তখন।
"ধান্য-ক্ষেত্রে জল সব যাইছে বহিয়া,
যতন পূর্বক জল বান্ধি রাখ গিয়া।"
আজ্ঞামাত্র শিষ্যবর করিল গমন,
ক্ষেত্রে বান্ধিবারে জল করিল যতন।
কিন্তু বান্ধ ভাঙ্গি জল যায় বেগভরে,
আপনি শুইল শিষ্য বান্ধের উপরে।
সমস্ত দিবস গেল, হইল রজনী
না আইল শিষ্য, গুরু চলিলা আপনি।
ক্ষেত্রমধ্যে গিয়া ডাক দিলা দ্বিজবর ;
শিষ্য বলে, "শুয়ে আছি বান্ধের উপর।

বহু যত্ন করিলাম, না রহে বন্ধন ;
আপনি শুইনু বান্ধে তাহার কারণ।"
শুনিয়া বলিলা গুরু, "আইস উঠিয়া।"
উঠি শিষ্য গুরুপদে প্রণমিলা গিয়া।
আশিস করিলা গুরু, "হউক কল্যাণ,
চারিবেদে সর্বশাস্ত্রে হোক্ তব জ্ঞান।"
এত বলি বিদায় করিলা দ্বিজবর,
প্রণাম করিয়া শিষ্য গেলা নিজঘর।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

প্রাচীন ভারতে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক কি রকম ছিল এই কবিতায় তাহা দেখান হইয়াছে। গুরুর আদেশে শিষ্য আরুণি কিভাবে জলে-ভরা জমিতে নিজে শুইয়া পড়িয়া বাঁধ দিয়া জলের স্রোতকে আটকাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং গুরু ইহা জানিতে পারিয়া কিভাবে আরুণিকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন—এই কবিতায় সেই সুন্দর কাহিনীর বর্ণনা আছে।

গদ্যরূপ ঃ—যাইছে—যাইতেছে, শুইনু—শুইলাম, যতন—যত্ন, বলিলা—বলিল, বান্ধি—বাঁধিয়া, দিলা—দিল, প্রণমিলা—প্রণাম করিল, করিলা—করিল, গেলা—গেল।

১। বিভিন্ন শব্দের গদ্যরূপ, ও কোন কোন শব্দের আধুনিক রূপ দেখাইয়া কবিতাটি গদ্যান্তর কর।

২। আরুণির গুরু আরুণিকে কি আদেশ করিলেন?

৩। আরুণি এই আদেশ কিভাবে পালন করিল?

৪। আরুণির গুরু আরুণিকে এই কাজের জন্য কি বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন?

৫। কবিতাটি মুখস্থ লিখ ও উহার সারাংশ নিজের ভাষায় লিখ।

৬। "চারিবেদে সর্বশাস্ত্রে হোক্ তব জ্ঞান"—কে, কাহাকে, কখন এই আশীর্বাদ করিলেন? 'চারিবেদ' সম্বন্ধে সংক্ষেপে টীকা লিখ।

৭। প্রাচীন ভারতে 'গুরুশিষ্যের সম্পর্ক' সম্বন্ধে ৫টি বাক্য রচনা কর।

৮। এই কবিতা পড়িয়া তুমি কি উপদেশ পাইলে সংক্ষেপে লিখ।

৯। বানান শেখ ও অর্থ বল ঃ—

শিষ্য, আজ্ঞামাত্র, রজনী, দ্বিজবর, শিষ্যবর, কল্যাণ, আশিস, শাস্ত্র, প্রণাম।

১০। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর (স্থূলাক্ষর পদগুলি) ঃ—

(ক) ডাকি তারে। (খ) জল বান্ধি রাখ গিয়া। (গ) না রহে বন্ধন। (ঘ) গুরুপদে প্রণমিলা। (ঙ) গেলা নিজঘর।

১১। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্' (শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞানলাভ করে) এই শিক্ষার দৃষ্টান্ত হিসাবে 'আরুণির কথা যদি বল, তবে তাহা কিভাবে বুঝাইয়া দিবে?



আরুণি

—কাশীরাম দাস

[বাংলা মহাভারতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি কাশীরাম দাস। তাঁহার বাড়ী ছিল বর্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রামে। কাশীদাসী মহাভারত বাঙ্গালীর অত্যন্ত প্রিয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি সংস্কৃতে লেখা মূল মহাভারত হইতে বাংলায় মহাভারত অনুবাদ করেন।]

আরুণি নামেতে ছিল শিষ্য একজন
ডাকি তারে গুরু আজ্ঞা করেন তখন।
"ধান্য-ক্ষেত্রে জল সব যাইছে বহিয়া,
যতন পূর্বক জল বান্ধি রাখ গিয়া।"
আজ্ঞামাত্র শিষ্যবর করিল গমন,
ক্ষেত্রে বান্ধিবারে জল করিল যতন।
কিন্তু বান্ধ ভাঙ্গি জল যায় বেগভরে,
আপনি শুইল শিষ্য বান্ধের উপরে।
সমস্ত দিবস গেল, হইল রজনী
না আইল শিষ্য, গুরু চলিলা আপনি।
ক্ষেত্রমধ্যে গিয়া ডাক দিলা দ্বিজবর ;
শিষ্য বলে, "শুয়ে আছি বান্ধের উপর।

বহু যত্ন করিলাম, না রহে বন্ধন ;
আপনি শুইনু বান্ধে তাহার কারণ।"
শুনিয়া বলিলা গুরু, "আইস উঠিয়া।"
উঠি শিষ্য গুরুপদে প্রণমিলা গিয়া।
আশিস করিলা গুরু, "হউক কল্যাণ,
চারিবেদে সর্বশাস্ত্রে হোক্ তব জ্ঞান।"
এত বলি বিদায় করিলা দ্বিজবর,
প্রণাম করিয়া শিষ্য গেলা নিজঘর।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

প্রাচীন ভারতে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক কি রকম ছিল এই কবিতায় তাহা দেখান হইয়াছে। গুরুর আদেশে শিষ্য আরুণি কিভাবে জলে-ভরা জমিতে নিজে শুইয়া পড়িয়া বাঁধ দিয়া জলের স্রোতকে আটকাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং গুরু ইহা জানিতে পারিয়া কিভাবে আরুণিকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন—এই কবিতায় সেই সুন্দর কাহিনীর বর্ণনা আছে।

গদ্যরূপ ঃ—যাইছে—যাইতেছে, শুইনু—শুইলাম, যতন—যত্ন, বলিলা—বলিল, বান্ধি—বাঁধিয়া, দিলা—দিল, প্রণমিলা—প্রণাম করিল, করিলা—করিল, গেলা—গেল।

১। বিভিন্ন শব্দের গদ্যরূপ, ও কোন কোন শব্দের আধুনিক রূপ দেখাইয়া কবিতাটি গদ্যান্তর কর।

২। আরুণির গুরু আরুণিকে কি আদেশ করিলেন?

৩। আরুণি এই আদেশ কিভাবে পালন করিল?

৪। আরুণির গুরু আরুণিকে এই কাজের জন্য কি বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন?

৫। কবিতাটি মুখস্থ লিখ ও উহার সারাংশ নিজের ভাষায় লিখ।

৬। "চারিবেদে সর্বশাস্ত্রে হোক্ তব জ্ঞান"—কে, কাহাকে, কখন এই আশীর্বাদ করিলেন? 'চারিবেদ' সম্বন্ধে সংক্ষেপে টীকা লিখ।

৭। প্রাচীন ভারতে 'গুরুশিষ্যের সম্পর্ক' সম্বন্ধে ৫টি বাক্য রচনা কর।

৮। এই কবিতা পড়িয়া তুমি কি উপদেশ পাইলে সংক্ষেপে লিখ।

৯। বানান শেখ ও অর্থ বল ঃ—

শিষ্য, আজ্ঞামাত্র, রজনী, দ্বিজবর, শিষ্যবর, কল্যাণ, আশিস, শাস্ত্র, প্রণাম।

১০। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর (স্থূলাক্ষর পদগুলি) ঃ—

(ক) ডাকি **তারে**। (খ) **জল** বান্ধি রাখ গিয়া। (গ) না রহে **বন্ধন**। (ঘ) **গুরুপদে** প্রণমিলা। (ঙ) গেলা **নিজঘর**।

১১। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্' (শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞানলাভ করে) এই শিক্ষার দৃষ্টান্ত হিসাবে 'আরুণির কথা যদি বল, তবে তাহা কিভাবে বুঝাইয়া দিবে?



খল ও নিন্দুক

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

[উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা কবিতা খুব উঁচু দরের ছিল না। ঐ সময় কবিগান, পাঁচালি ও টপ্পাগানে বাংলা কবিতার আসর ভরা ছিল। এমন সময় ১৮১২ খ্রীঃ অব্দে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব হয়। তিনি বাংলা কবিতায় নূতন ধারা আনেন। নিজের দেশকে মা বলিয়া মনে করা, দেশকে ভালবাসা ও সেবা করা, মানুষের চরিত্রের ন্যায়নীতি বোধের পরিচয় দেওয়া—এই সব লইয়া তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন।]

মহৎ যে হয় তার সাধু ব্যবহার।
উপকার বিনা নাহি জানে অপকার।
দেখহ কুঠার করে চন্দন ছেদন।
চন্দন সুবাস তারে করে বিতরণ।
কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কানে।
কোকিল অখিল প্রিয় সুমধুর গানে।
গুণময় হইলেই মান সব ঠাঁই।
গুণহীনে সমাদর কোনোখানে নাই।
সারী আর শুক পাখী, অনেকেই রাখে।
যত্ন করি কে কোথায়, কাক পুষে থাকে?
অধমে রতন পেলে, কি হইবে ফল?
উপদেশে কখন কি সাধু হয় খল?
ভাল-মন্দ, দোষ-গুণ, আধারেতে ধরে।

ভুজঙ্গ অমৃত খেয়ে গরল উগারে।
লবণ জলধি জল করিয়া ভক্ষণ।
জলধর করিতেছে সুধা বরিষণ।
সুজনে সুযশ গায়, কুযশ ঢাকিয়া।
কুজনে কুরব করে, সুরব নাশিয়া।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

'খল ও নিন্দুক' কবিতায় মহৎ বনাম খল চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের কথা কয়েকটি সুন্দর দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। মহৎ চরিত্রের লোক সব অবস্থাতেই মহত্ত্বের পরিচয় দেয়, আর খল চরিত্রের লোক কোন অবস্থাতেই তাহার হীনত্ব পরিত্যাগ করিতে পারে না।

গদ্যরূপ :— দেখহ—দেখ, রতন—রত্ন, উগারে—উগরায়, বরিষণ—বর্ষণ।

১। 'খল ও নিন্দুক' কবিতার মূল কথা কী? খল ও নিন্দুক, কাহার চরিত্রের কী বৈশিষ্ট্য?

২। মহতের ধর্ম কী? কবি এই কবিতায় যে সকল মহতের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহারা কে কিরূপে মানুষের উপকার করে? কাহারা সর্বত্র মান পায়? কাহাদের কোনও জায়গায় আদর নাই? অকারণ নিন্দা ও অপকার করে এরূপ কয়েকজনের উদাহরণ দাও।

৩। উক্তিগুলির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও :—

(ক) গুণময় হইলেই............নাই। (খ) অধমে রতন............খল?

(গ) সুজনে............নাশিয়া।

৪। অর্থ লিখ :— অপকার, কুঠার, ছেদন, সুবাস, অখিল, ঠাঁই, ভুজঙ্গ, গরল, জলধি, জলধর, সুধা, সুজন, সুযশ, কুযশ, কুজন, কুরব, সুরব, আধার, গুণময়।

৫। বাক্য রচনা কর :— সাধু ব্যবহার; বিষলাগা; সমাদর; ভাল-মন্দ; দোষ-গুণ; গুণহীন; অধম; জলধর; সুমধুর।

৬। বানান শিখ :— ব্যবহার, বিষ, বিতরণ, সুযশ, লবণ, দোষগুণ, গুণময়, সুবাস।

৭। কবিতাটি মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি কর।

৮। কবিতাটি সরল গদ্যে রূপান্তরিত কর।

বঙ্গভাষা

—মধুসূদন দত্ত

[বাংলা কবিতার প্রথম সার্থক লিরিকধর্মী কবি মধুসূদন মাতৃভাষায় মহামূল্য সম্পদের কথা ও নিজের মূঢ়তার জন্য অনুশোচনার কথা এখানে বলিয়াছেন।]

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায় অনাহারে সঁপি কায়, মন,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি
কেলিনু শৈবালে ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
'ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যারে ফিরে ঘরে!'
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণি জালে।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১৮২৪ খ্রীঃ অব্দে যশোহরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে মধুসূদনের জন্ম হয়। মধুসূদনের প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমা সম্ভব'। তাঁহার লেখা শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'মেঘনাদ বধ'। পরে তিনি 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা' কাব্য রচনা করেন। তিনি কয়েকখানি ভাল নাটকও রচনা করেন। তিনি যখন ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে ছিলেন তখন তিনি কতকগুলি সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন। 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি তাঁহার রচিত একটি চতুর্দশপদী কবিতা। ১৪ পংক্তিতে লেখা কবিতার নাম চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট।

মধুসূদন মনেপ্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন। বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার প্রতি কবির যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহার পরিচয় 'বঙ্গভাষা' কবিতায় পাওয়া যায়।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যে অনেক মূল্যবান সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কবি যে দীর্ঘকাল উহা অবহেলা করিয়া বিদেশী ভাব, ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট

করিয়াছেন তাহার জন্য এই কবিতায় তিনি গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। পরে তিনি বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা আরম্ভ করেন ও মনে গভীর শান্তি লাভ করেন।

টীকা ঃ— তপে—তপস্যায়, কুললক্ষ্মী—বংশের লক্ষ্মী, (এখানে কবি 'বঙ্গ-লক্ষ্মী'কে বুঝাইতেছেন); মাতৃকোষে—মায়ের ভাণ্ডারে (এখানে 'বঙ্গভাষার' ভাণ্ডারে)।

গদ্যরূপ ঃ— করিনু—করিলাম। আচরি—আচরণ করিয়া। কাটাইনু—কাটাইলাম। পরিহরি—পরিহার করিয়া। সঁপি—সঁপিয়া। মজিনু—মগ্ন হইলাম। কেলিনু—খেলা করিলাম।

১। কবিতাটি মুখস্থ কর এবং ঠিকমত ছন্দ রক্ষা করিয়া আবৃত্তি কর। এইভাবে ছন্দ ঠিক করিয়া পড়িবে ঃ

হে বঙ্গ ভান্/ডারে তব/বিবিধ র/তন
তা সবে (অ/বোধ আমি)/অবহেলা/করি
পরধন/লোভে মত্ত/করিনু ভ্র/মণ
পরদেশে,/ভিক্ষাবৃত্তি/কুক্ষণে আ/চরি

২। 'হে বঙ্গ' বলিয়া কবি কাহাকে সম্বোধন করিয়াছেন?

৩। বঙ্গের ভাণ্ডারে বিবিধ 'রতন' কি হইতে পারে? কবি নিজেকে 'অবোধ আমি' মনে করেন কেন?

৪। কবি কোন্ জাতীয় পরধনের লোভে মত্ত হইয়া পরদেশে ভ্রমণ করিলেন?

৫। কবি 'ভিক্ষাবৃত্তি' আচরণ করিলেন এবং 'কুক্ষণে' করিলেন। এই 'ভিক্ষা-বৃত্তি' এবং 'কুক্ষণে' কথা দুইটির তাৎপর্য কি?

৬। কবি অবরেণ্যকে বরণ করিয়া বিফল তপস্যায় মগ্ন হইলেন এবং কমল-কানন ভুলিয়া শৈবালে খেলা করিলেন—কবির এই দুঃখের ভাবটি বুঝাইয়া বল।

৭। স্বপ্নে বঙ্গের 'কুললক্ষ্মী' কবিকে কি বলিলেন? 'স্বপ্নে বলিলেন' এবং 'বঙ্গের কুললক্ষ্মী'—এই কথা দুইটির ভাবার্থ পরিস্ফুট কর।

৮। বঙ্গের 'কুললক্ষ্মীর' আদেশ কবি কিভাবে পালন করিলেন এবং উহার ফলে তিনি কি লাভ করিলেন?

৯। 'পালিলাম আজ্ঞা সুখে'—কবি কোন্ আজ্ঞা, কেন পালন করিলেন? ইহাতে তিনি কি লাভ করিলেন? 'সুখে' কথাটির তাৎপর্য কি?

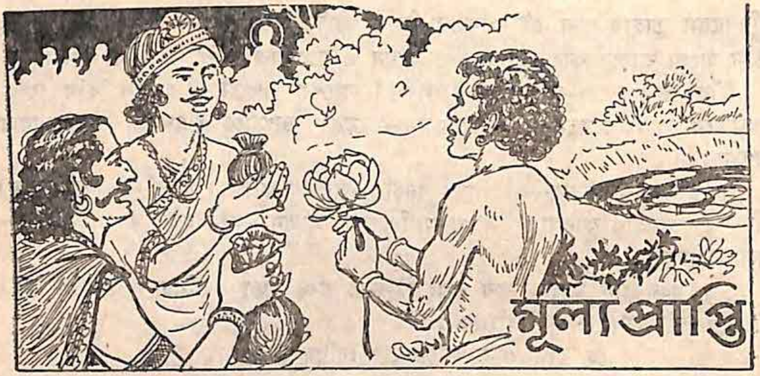
১০। 'বঙ্গভাষা' কবিতার সারাংশ নিজের ভাষায় লিখ।

১১। অর্থ লিখ ঃ— বিবিধ, মত্ত, করি, অবরেণ্য, মাতৃকোষে, মণি জাল।

১২। মাতৃভাষা-রূপ খনি পূর্ণ মণি জালে—এই কথার তাৎপর্য কি?

১৩। কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ—

(ক) তা সবে............অবহেলা করি। (খ) পরধন লোভে মত্ত। (গ) সুখ পরিহরি। (ঘ) সঁপি কায়, মন। (ঙ) অবরেণ্যে বরি। (চ) ভুলি কমল-কানন। (ছ) পালিলাম আজ্ঞা। (জ) পূর্ণ মণি জালে।



—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অঘ্রাণে শীতের রাতে   নিষ্ঠুর শিশিরাঘাতে
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া।
সুদাস মালীর ঘরে   কাননের সরোবরে
একটি ফুটেছে কি করিয়া।
তুলি' লয়ে বেচিবারে   গেল সে প্রাসাদ-দ্বারে
মাগিল রাজার দরশন ;
হেন কালে হেরি' ফুল   আনন্দে পুলকাকুল
পথিক কহিল একজন—
'অকালের পদ্ম তব,   আমি এ'টি কিনি' লব
কত মূল্য লইবে ইহার?
ভগবান বুদ্ধ আজ   এসেছেন পুরমাঝ
তাঁর পায়ে দিব উপহার।'
মালী কহে—'এক মাষা   স্বর্ণ পাব মনে আশা।'
পথিক চাহিল তাহা দিতে।
হেনকালে সমারোহে   বহু পূজা-অর্ঘ্য বহে
নৃপতি বাহিরে আচম্বিতে।
রাজেন্দ্র প্রসেনজিৎ   উচ্চারি মঙ্গল-গীত
চলেছেন বুদ্ধ দরশনে ;

হেরি' অকালের ফ্ল শ্ধালেন—'কত ম্ল?
কিনি দিব প্রভ্র চরণে।'
মালী কহে, 'হে রাজন্ স্বর্ণ মাষা দিয়ে পণ
কিনেছেন এই মহাশয়।'
'দশ মাষা দিব আমি'— কহিল ধরণী-স্বামী
'বিশ মাষা দিব'—পান্থ কয়।
দোঁহে কহে,—'দেহ' 'দেহ', হার নাহি মানে কেহ
ম্ল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত।
মালী ভাবে, যাঁর তরে এ দোঁহে বিবাদ করে
তাঁরে দিলে আরো পাব কত।
কহিল সে করজোড়ে— 'দয়া করে ক্ষম মোরে,
এ ফ্ল বেচিতে নাহি মন।'
এত বলি' ছ্টিল সে যেথা রয়েছেন ব'সে
ব্দ্ধদেব উজলি কানন।
বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে
নিরঞ্জন আনন্দ-ম্রতি ;
দৃষ্টি হ'তে শান্তি ঝরে স্ফ্রিছে অধর 'পরে
কর্ণার স্ধা-হাস্য-জ্যোতিঃ।
স্দাস রহিল চাহি,— নয়নে নিমেষ নাহি
ম্খে তার বাক্য নাহি সরে।
সহসা ভ্তলে পড়ি পদ্মটি রাখিল ধরি'
প্রভ্র চরণপদ্ম 'পরে।
বরষি অমৃত রাশি ব্দ্ধ শ্ধালেন হাসি'—
"কহ বৎস, কি তব প্রার্থনা?"
ব্যাকুল স্দাস কহে— 'প্রভ্, আর কিছ্ নহে—
চরণের ধ্লা এক কণা'।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অন্শীলন

ব্দ্ধদেবের জীবনের নানা ঘটনা লইয়া রবীন্দ্রনাথ অনেক স্ন্দর স্ন্দর কবিতা লিখিয়াছেন। 'ম্ল্যপ্রাপ্তি' কবিতাটি তাহার মধ্যে একটি। স্দাস তাহার পদ্মফ্লের কি ম্ল্য পাইল? এই প্রশ্নের অর্থ ব্ঝিলেই

কবিতার 'মূল্যপ্রাপ্তি' নামের অর্থ বোঝা যাইবে। সুদাস পদ্মফুল বেচিয়া পয়সা পাইলে উহা দ্বারা তাহার পেট ভরিত, সংসারের অন্য অভাব মিটিত। বুদ্ধদেবের চরণে পদ্মফুলটি নিবেদন করিয়াও সে মূল্য পাইল, কিন্তু উহা পয়সার মূল্য নহে, উহা বুদ্ধদেবের করুণা ও শান্তির মূল্য। ইহাতে সুদাসের মন ভরিল, জীবন ধন্য হইল। ইহা অপেক্ষা অধিক মূল্য আর কি হইতে পারে? ইহাই সুদাসের মূল্যপ্রাপ্তি।

টীকা :— নিরঞ্জন—নাই অঞ্জন বা বর্ণ যাহার, সব রকম রং বা বর্ণের অতীত যিনি। ঈশ্বরকে বলা হয় নিরঞ্জন।

মাষা—ভরি বা তোলার মত প্রাচীন কালের একপ্রকার ওজন।

১। কবিতাটি মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি কর।

২। সুদাস মালী অকালের পদ্মফুলটি লইয়া প্রাসাদ-দ্বারে গেল কেন?

৩। ঐ ফুলটি দেখিয়া একজন পথিক আনন্দে আকুল হইল কেন?

৪। নৃপতি প্রসেনজিৎ পূজা-অর্ঘ্য লইয়া কোথায় যাইতেছিলেন?

৫। পথিক ও রাজা উভয়েই একটি ফুলের জন্য কিভাবে ও কেন দর কষাকষি করিল?

৬। মালী কাহাকেও ফুলটি দিতে চাহিল না কেন?

৭। 'সুদাস রহিল চাহি.........বাক্য নাহি সরে'—সুদাসের এইরূপ ভাব হইবার কারণ কি?

৮। সুদাস পদ্মফুলটি দিয়া কি করিল? সে বুদ্ধদেবের নিকট কেবল এক কণা চরণের ধূলি প্রার্থনা করিল কেন?

৯। কবিতায় বর্ণিত কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর ও এই কবিতার মূল ভাবটি কি বুঝাইয়া বল।

১০। অর্থ লিখ :— পুলকাকুল, সমারোহে, পূজা-অর্ঘ্য, প্রসন্ন, আচম্বিতে, পান্থ, করজোড়ে, সুধা-হাস্য-জ্যোতিঃ, অধর, নিমেষ, চরণপদ্ম, ধরণী-স্বামী, ক্রমাগত, মঙ্গলগীত, পুরমাঝ।

১১। বাক্য রচনা কর :— পুলকাকুল, পূজা-অর্ঘ্য, আচম্বিতে, ক্রমাগত, করজোড়ে, প্রসন্ন, প্রশস্ত, নিরঞ্জন, নিমেষ, ব্যাকুল।

১২। গদ্যরূপ লিখ :— মাগিল, হেনকালে, দরশন, পুরমাঝ, উচ্চারি, দরশনে, হেরি, শুধালেন, দোহে, ক্ষম, উজলি, স্ফুরিছে, বরষি, শুধালেন।

১৩। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :— শিশিরাঘাতে, পুলকাকুল, রাজেন্দ্র, ক্রমাগত, পদ্মাসনে, ব্যাকুল।

ভারত সঙ্গীত

—অতুলপ্রসাদ সেন

[কবি অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে। ইনি লক্ষ্মৌয়ে বিখ্যাত ব্যারিস্টার ছিলেন। ইনি গানের কবি ও বিখ্যাত সুরকার। রচিত পুস্তক—কাকলি, কয়েকটি গান, গীতিগুঞ্জ।]

হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর
হও উন্নতশির,—নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান
সাথে আছে ভগবান্—হবে জয়।
নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্ ;
দেখিয়া ভারতে মহা-জাতির উত্থান,
জগজন মানিবে বিস্ময়।
জগজন মানিবে বিস্ময়!
তেত্রিশ কোটি মোরা, নহি কভু ক্ষীণ
হতে পারি দীন, তবু নাহি মোরা হীন,
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন।
ঐ দেখ প্রভাত উদয়।
ঐ দেখ প্রভাত উদয়!
ন্যায় বিরাজিত যাদের করে
বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে;
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে,
সত্যের নাহি পরাজয়।
সত্যের নাহি পরাজয়।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

ভারত সঙ্গীত : পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা ও নবজাগরণের জন্য কবি ভারতের জীবন ও সভ্যতার মূল সত্যের কথা ভারতবাসীকে মনে করাইয়া দিয়া যে

গান গাহিয়াছেন তাহাই 'ভারত সঙ্গীত'। কবি ভারতবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—তোমরা ধর্মে মতি স্থির কর, বীরের মত কর্ম কর, মাথা উঁচু করিয়া চল, উচ্চ নীচের পার্থক্য ভুলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হও। ঈশ্বর সহায় আছেন, জয় তোমাদের হইবেই। ভারতের বহু ভাষাভাষী লোকের মধ্যে যে ঐক্য আছে তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। ভারতে এক বিরাট জাতির জাগরণ ঘটিবে, তাহা দেখিয়া জগতের লোক বিস্মিত হইবে। আমরা দরিদ্র হইলেও হীন নহি। নূতন ভারতের আবির্ভাব লক্ষ্য কর। ন্যায় তোমাদের হাতে আছে, তাই সব রকম বিপদ কাটিয়া যাইবে। তোমাদের মিলিত শক্তি বিদেশীর স্বার্থ চক্রান্তকে ব্যর্থ করিবে, সত্যের জয় হইবেই।

শব্দার্থ ও টীকা ঃ— ধরমেতে—ধর্মে; করমেতে—কর্মে; জগজন—জগতের মানুষ; জনম—জন্ম; মহা-জাতি—নানা ভাষাভাষী, নানা সম্প্রদায়ের মানুষকে লইয়া এক বিরাট জাতি; আগুয়ান—অগ্রসর।

১। এই কবিতার বিষয়বস্তু আলোচনা করিয়া 'ভারত সঙ্গীত' নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

২। 'হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর'—এই পংক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

৩। কবি 'ভেদাভেদ জ্ঞান' ভুলিতে আহবান জানাইয়াছেন কেন?

৪। কবি যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন তাহা কিভাবে বুঝিতে পার?

৫। 'বিবিধের মাঝে মিলন মহান' ও 'মহাজাতির উত্থান'—ইহার অর্থ ভালভাবে বুঝাইয়া দাও।

৬। 'ঐ দেখ প্রভাত উদয়'—কবি কোন্ প্রভাত দেখিতে বলিতেছেন?

৭। 'ন্যায় বিরাজিত......সত্যের নাহি পরাজয়'—এই পংক্তি কয়টির মধ্যে কবি ন্যায়, সাম্য ও সত্য সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন?

৮। কবিতাটি মুখস্থ কর ও মাত্রা ঠিক রাখিয়া আবৃত্তি কর। ক্লাসের কয়েক-জন একত্র হইয়া আবৃত্তি কর। সম্ভব হইলে গানের সুরটি শিখিয়া লও ও সমবেত কণ্ঠে গান কর।

৯। 'এক জাতি এক প্রাণ একতা'—এই ভাবটি আলোচ্য কবিতার কোন্ কোন্ পংক্তির মধ্যে আছে?

১০। কবিতাটি সরল গদ্যে রূপান্তর কর।

১১। এই কবিতায় কবির গভীর আশাবাদ ও দেশপ্রেমের ভাবটি বুঝাইয়া দাও।

১২। বানান শেখ ও অর্থ বল ঃ— ধীর, উত্থান, বিস্ময়, ক্ষীণ, সাম্য, স্বার্থ, ভেদাভেদ, বিরাজিত, বিবিধ, পরিধান।

১৩। সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ— ভেদাভেদ, উত্থান, স্বার্থ।

১৪। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ ঃ— সাম্য, সত্য, পরাজয়, স্বার্থ, উদয়, সুদিন, উত্থান, মহান, ভেদ, ভয়, ক্ষীণ।

ক্রীতদাস



—কালিদাস রায়

[কবিশেখর কালিদাস রায় ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি। তিনি খুব দরদী কবিও বটে। বিভিন্ন শিক্ষা ও নীতিমূলক কাহিনী অবলম্বনে তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। কিশলয়, পর্ণপুট, ব্রজবেণু, গাথাঞ্জলি, আহরণী প্রভৃতি বহু কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন। এই কবিতাটিতে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। মানুষ নিজে দুঃখ ভোগ না করিলে পরের দুঃখের মর্ম বুঝে না, ও দাসত্বের মত দুর্বিষহ জীবন আর নাই—এই দুইটি শিক্ষা এই কবিতা হইতে পাওয়া যায়।]

বাগ্‌দাদ-পথে করেন ভ্রমণ লোকমান পণ্ডিত,
জীর্ণ-বসন শীর্ণ-শরীর কদাকার কুৎসিত।
নিজ পলাতক ক্রীতদাস ভ্রমে একজন নাগরিক,
গৃহে ল'য়ে এসে তাঁহারে প্রহার করিল অত্যধিক।
সপ্তাহ ধরি' বন্দী রাখিল অন্ধ-কূপের মাঝে,
অবশেষে তারে নিয়োজিল নিজ গৃহ-নির্মাণ কাজে।
রোদে পুড়ে' শীতে জমে', জলে ভিজে অবিরত দিনরাত—
খাটিতে লাগিল সুধী লোকমান শরীর করিয়া পাত!
আসল নফর ফিরিল, এদিকে আসিল বছর ঘুরে,—
তাহারে হেরিয়া গৃহস্বামীর ভ্রান্তি যাইল দূরে।
লজ্জিত হ'য়ে যোড়হাতে কয় নাগরিক সদাগর—
"ক্ষমা কর মোরে, কে তুমি অতিথি, কোথায় তোমার ঘর?"

লোকমান কয়, "ওহে নির্দয়, মিছে চাও আজি ক্ষমা,
গোটা বছরের লাঞ্ছনা ঢের পিঠে হয়ে আছে জমা।
মম শ্রম-ফল হয় নি বিফল,—বছর তো গেল কেটে',
বহুজ্ঞান আমি লভিয়াছি স্বামী তোমার দুয়ারে খেটে'।
বুঝেছি সত্য, ক্রীতদাসত্ব কত যন্ত্রণাময়,
মানুষেরি হাতে হায় রে মানুষ কত লাঞ্ছনা সয়!
আমারও রয়েছে বহু দাস-দাসী, এমনি তো তাহাদের
হয় যন্ত্রণা লাঞ্ছনা কত,—এখন পেয়েছি টের।
এ জ্ঞানের ভাগ কিছু লও তুমি, হয়ো নাক নির্মম,
পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা, অন্ততঃ তারে ক্ষম।
গৃহে ফিরে মম ক্রীতদাসগণে মুক্ত করিব আমি,
বাগ্‌দাদে এসে যে-জ্ঞান লভিনু সবচেয়ে তাহা দামী।"

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১। কবিতাটি মুখস্থ কর ও সুন্দর ভাবে, যত্ন সহকারে আবৃত্তি কর।

২। 'ক্রীতদাস' কবিতার কাহিনী নিজ ভাষায় লিখ ও ইহা হইতে কি শিক্ষা পাইলে বল।

৩। বাগদাদের নাগরিক লোকমান পণ্ডিতকে নিজের ক্রীতদাস ভ্রম করিয়া তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিল?

৪। নাগরিক সওদাগরের কিভাবে ভ্রম কাটিল? এই ভ্রম সংশোধন করিবার জন্য সে কি করিল?

৫। 'বাগদাদে এসে যে জ্ঞান লভিনু সবচেয়ে তাহা দামী'।—কোন্ জ্ঞান কে, কিভাবে লাভ করিল? এই জ্ঞান সবচেয়ে দামী কেন?

৬। অর্থ লিখ ও ব্যবহার শিখ ঃ—জীর্ণ বসন, শীর্ণ শরীর, কদাকার, পলাতক, ক্রীতদাস, অন্ধকূপ, অবিরত, ভ্রান্তি, নির্মম, যন্ত্রণাময়।

৭। গদ্যরূপ লিখ ঃ— নিয়োজিল, হেরিয়া, যাইল, মম, ক্ষম, লভিনু।

৮। সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ—অত্যধিক, নির্মম, স্বাধীনতা, নির্দয়।

৯। বানান শিখ ঃ— ভ্রমণ, জীর্ণ, শীর্ণ, কুৎসিত, কূপ, নির্মাণ, গৃহস্বামী, সুখী, ক্ষমা, লাঞ্ছনা, স্বামী, যন্ত্রণা, অন্ততঃ।

১০। 'সবারে উপরে মানুষ সত্য'—এই ভাবটি বুঝাইয়া ৫।৬টি বাক্য রচনা কর।

ছেলের দল

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[জন্ম—১৮৮২, মৃত্যু—১৯২২। নানা ধরণের বাংলা কবিতা লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। সুন্দর সুন্দর ছন্দ ব্যবহার করিতেন বলিয়া তাঁহাকে বলা হয় 'ছন্দের যাদুকর'। তাঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'কুহু ও কেকা', 'অভ্র-আবীর'। 'ছেলেদের দল' কবিতায় কবি তরুণ, তাজা-প্রাণ ছেলেদের অভিনন্দিত করিয়াছেন। ছেলের দলকে এমন উৎসাহিত করা ও তাদের সম্বন্ধে এমন উচ্চ ভাব ও আশা পোষণ করা—বাংলা কাব্যে কমই দেখা যায়।]

হল্লা ক'রে ছুটির পরে ওই যে যারা যাচ্ছে পথে—
হাল্কা হাসি হাস্‌ছে কেবল,—ভাস্‌ছে যেন আল্‌গা স্রোতে—
কেউ বা শিষ্ট, কেউ বা চপল, কেউ বা উগ্র, কেউ বা মিঠে।
ওই আমাদের ছেলেরা সব—ভাবনা যা তা ওদের পিঠে।
ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল—
ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল ;—
আদর্শে যে সত্য মানে—সে ওই মোদের ছেলের দল।
ওরাই ভালবাস্‌তে জানে
দরদ দিয়ে সরল প্রাণে,
প্রাণের হাসি হাস্‌তে জানে, খুল্‌তে জানে মনের কল,—
ওই যে দুষ্ট, ওই যে চপল—ওই আমাদের ছেলের দল।
ওরাই রাখে জ্বালিয়ে শিখা বিশ্ব-বিদ্যা-শিক্ষালয়ে,
অন্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হয়ে ;
পুরাতনে শ্রদ্ধা রাখে নূতনেরও আদর জানে,
ওই আমাদের ছেলেরা সব—নেইক দ্বিধা ওদের প্রাণে।
ওই আমাদের ছেলেরা সব—ঘুচিয়ে অগৌরবের রব
দেশ-দেশান্তে ছুটছে আজি আনতে দেশে জ্ঞান-বিভব ;
মার্কিনে আর জার্মানিতে, পাচ্ছে তারা তপের ফল,
হিবাচিতে আগুন জেবলে শিখ্‌ছে ওরা কব্জাকল,
হোমের শিখা ওরাই জ্বালে,
জ্ঞানের টিকা ওদের ভালে,

সকল দেশে সকল কালে উৎসাহ-তেজ অচঞ্চল,
ওই আমাদের আশার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১। কবিতাটি মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি কর।

২। কবি কিভাবে ছেলের দলের প্রশস্তি গাহিয়াছেন সুন্দর ভাবে গুছাইয়া লিখ।

৩। এই কথাগুলির তাৎপর্য পরিস্ফুট কর :—

(ক) 'ভাবনা.........পিঠে। (খ) ওই আমাদের অমর প্রদীপ। (গ) ওই আমাদের পুণ্যফল। (ঘ) খুলতে জানে মনের কল। (ঙ) অন্নহীনে......... লক্ষ্মী হয়ে। (চ) হোমের শিখা.........ওদের ভালে। (ছ) ওই আমাদের আশার প্রদীপ।

৪। অন্তর্নিহিত ভাব বিস্তারিত করিয়া লিখ :—

(ক) মার্কিনে.........কব্জাকল। (খ) পুরাতনে.........জানে।

৫। অর্থ লিখ :— শিষ্ট, নিখাদ সোনা, দ্বিধা, জ্ঞান বিভব, অচঞ্চল।

৬। বাক্য রচনা কর :— প্রাণের হাসি, অচঞ্চল, দেশ-দেশান্তে, হাল্কা হাসি, পুণ্যফল, অগৌরব।



অরণ্য

—বিহারীলাল চক্রবর্তী

[বিহারীলাল চক্রবর্তী ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে 'ভোরের পাখি' বলিয়াছেন। তিনি আধুনিক বাংলা গীতি কাব্যের পথ প্রদর্শক। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম 'সারদামঙ্গল'।

অরণ্য প্রকৃতির একটি নিখুঁত বাস্তব ভাষাচিত্র এই কবিতায় অঙ্কিত হইয়াছে। অরণ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখিবার মত একটি বিশিষ্ট কবি প্রকৃতি ইহার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।]

নিস্তব্ধ গম্ভীর ঘোর
নিবিড় গহন
ঘনপত্রে ঝোপে রুদ্ধ
রবির কিরণ ;
বহুশাখা প্রসারিয়ে
পরস্পর আলিঙ্গিয়ে
চক্রাকারে ঘেরে আছে
বৃক্ষ অগণন।
দীর্ঘ দীর্ঘ স্থূলকায়,
বল্লরী বেষ্টিত তায়,
কোটরে কোটরে কত
কুলায় শোভন,
কাহারো নেবেছে জটা
এঁকাবেঁকা কটা কটা

তেড়া চাড়া ঠেক্‌নার
খুঁটির মতন।
কাহারো শিকড় দল,
উঠিয়ে ব্যাপিছে তল,
কুঞ্জরের কঙ্কালের
পঞ্জর যেমন;
গাঢ় ঘন ছায়াময়,
জনমে বিস্ময় ভয়,
নিরন্তর ঝর ঝর
পত্রের পতন ;
কভু মৃগ-মৃগী ধায়
চকিত হইতে চায়
কভু দূরে শুনা যায়
ভীষণ গর্জন!

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১। কবিতাটি ভাষা ও ছন্দের গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া আবৃত্তি কর।

২। বিহারীলালের অরণ্য কবিতাটি অবলম্বন করিয়া অরণ্য প্রকৃতির রূপের পরিচয় দাও।

৩। এই কবিতার প্রথম আট পংক্তিতে যে একটি গাঢ়বদ্ধ, গম্ভীর ভাব আছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৪। "দীর্ঘ দীর্ঘ.........ভীষণ গর্জন"। —পংক্তিগুলির মধ্যে অরণ্য অভ্যন্তরে যে বিচিত্র রূপরেখা অঙ্কিত হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৫। এই কবিতায় যে উপমাগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৬। অর্থ লিখ ঃ— ঘোর, নিবিড়, গহন, অগণন, স্থূলকায়, বল্লরী, কুলায়, শোভন, কুঞ্জর, নিরন্তর, মৃগমৃগী, চকিত।

৭। বাক্য রচনা কর ঃ— নিবিড়, পরস্পর, চক্রাকারে, স্থূলকায়, তেড়াচাড়া, ছায়াময়, নিরন্তর।

৮। বানান শিখ ঃ— নিস্তব্ধ, নিবিড়, কিরণ, পরস্পর, অগণন, স্থূলকায়, বল্লরী, শিকড়, ভীষণ।

৯। সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ— নিস্তব্ধ, পরস্পর, চক্রাকারে, নিরন্তর।

১০। গদ্যরূপ লিখ ঃ— প্রসারিয়ে, আলিঙ্গিয়ে, তায়, ব্যাপিছে।

১১। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ ঃ—
নিস্তব্ধ, রুদ্ধ, দীর্ঘ, স্থূল, এঁকাবেঁকা, গাঢ়, ঘন, ভয়।



অখিল মাঝি

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

[জন্ম—১৮৮৩ মৃত্যু—১৯৭২। ভক্তিভাবের পল্লীপ্রীতির কবি। পল্লীপ্রকৃতির সহিত অভিন্ন এক সরল, অনাড়ম্বর মাঝির জীবনচিত্র এই কবিতায় আঁকা হইয়াছে। গ্রামের জমিদার তাঁহার আড়ম্বরপূর্ণ, বিলাসী জীবন অপেক্ষা দরিদ্র মাঝির সরল, সুন্দর, ভাবনাহীন জীবন অধিকতর কাম্য মনে করেন।]

অজয়ের বুকে সারাদিন
সারাদিন তরী বাহে।
সন্ধ্যাবেলায় আঙিনায়
জাল বোনে আর গাহে,
"সুখে আছি আমি হরি হে,
অভাবেরে আমি ডরিনে,
আমায় হিংসা করেনাক কেউ, কারেও হিংসা করিনে।"
চাঁদ উঠে দেখে আগে সে,
সম্ভাষে আগে রবি।
কোকিলের গানে জাগে সে,
গভীর শান্তি লভি'।
ধরে পাড়ি আর গাহে গান
"ধারিনে কাহারো হরি' নে,
আমায় হিংসা করেনাক কেউ, কারেও হিংসা করিনে।"
যবে মন্দিরে বাজে শাঁখ,
সাঁঝের আঁধার জমে,
দাঁড় থামায়ে সে ক্ষণকাল
হরির চরণে নমে।
শরীরে তাহার নাহি রোগ,
দেহে লাগে বটে কাদা,
বন-টগরের মত তার হৃদিখানি রয় সাদা।
একটা গাঁয়ের জমিদার
ক'ন তরী হ'তে নামি'
"দুনিয়ার মাঝে একা তোরে
হিংসা করি রে আমি।
জমিদারি দিয়ে ডিঙিখান
নিতে আমি আছি রাজী,
বিনিময়ে তোর মত প্রাণ পাই যদি ওরে মাঝি।"

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১। এই কবিতাটি মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি কর।

২। 'অখিল মাঝি' কবিতায় বাংলাদেশের পল্লীর এক মাঝির সরল, অনাড়ম্বর জীবনের পরিচয় দাও। গ্রামের জমিদার মাঝির জীবনকে অধিকতর স্পৃহণীয় মনে করেন কেন?

৩। তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর :—

(ক) 'আমার হিংসা............হিংসা করিনে।'

(খ) 'বন টগরের............সাদা।' (গ) 'দুনিয়ার............আমি।'

৪। অর্থ লিখ :— আঙিনা, ক্ষণকাল, হৃদিখানি, বিনিময়ে, দুনিয়া, সম্ভাষে।

৫। বাক্য রচনা কর :— সারাদিন, ক্ষণকাল, দুনিয়া, জমিদারি, বিনিময়ে।

৬। গ্রামের মাঝি ও গ্রামের জমিদারের একটা তুলনামূলক জীবন চিত্র আঁক।



—নজরুল ইসলাম

উর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্।
চল্ চল্ চল্॥
ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল॥
নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল!
চল্‌রে নও-জোয়ান,
শোন্‌রে পাতিয়া কান্—
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে
জীবনের আহ্বান।
ভাঙ্‌রে ভাঙ আগল,
চল্‌রে চল্‌রে চল্
চল্ চল্ চল্॥

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

কবি-পরিচিতি ঃ কাজী নজরুল ইসলাম ১৩০৬ বঙ্গাব্দে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি সৈনিক ছিলেন। তাঁহার কবিতাগুলি দেশাত্মবোধক ও উদ্দীপক এজন্য তাঁহাকে 'বিদ্রোহী কবি' বলা হয়। 'অগ্নিবীণা', বিষের বাঁশী প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। বর্তমানে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া বাক্‌শক্তি রহিত অবস্থায় আছেন।

কবিতার ভাবার্থ ঃ আমরা তরুণের দল আগাইয়া যাইব। আমাদের প্রাণে অফুরন্ত শক্তি ও সাহস আছে। বাধাবিঘ্ন দূর করিয়া আমরাই আমাদের মাতৃভূমিকে নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিব। এই প্রাণহীন শ্মশানের মত দেশে আমরা নূতন জীবনের উদ্দীপনা ও স্পন্দন সঞ্চার করিব।

১। কবিতাটি মুখস্থ করিয়া এককভাবে ও সমবেতভাবে আবৃত্তি কর।

২। অর্থ লিখ ঃ— ঊর্ধ্ব, গগনে, মাদল, উতলা, অরুণ, রাঙা, তিমির, বাধার বিন্ধ্যাচল, নব নবীনের, সজীব, আহ্বান, দানিব।

৩। বাক্য রচনা কর ঃ ধরণী, তিমির, নবীন, নওজোয়ান।

৪। প্রশ্নগুলির উত্তর লিখ ঃ

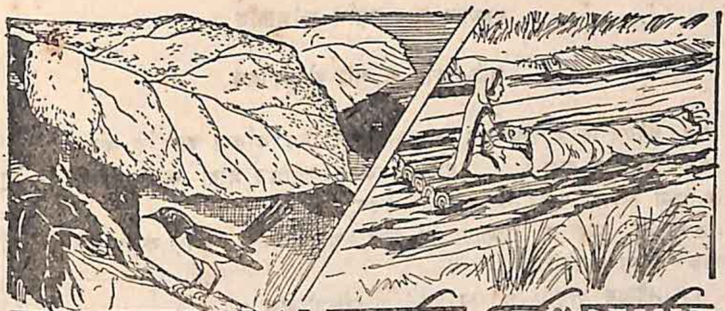
(ক) কবি দেশের তরুণদলকে কি করিতে বলিয়াছেন?

(খ) তাহারা ঊষার দুয়ারে আঘাত হানিয়া কি আনিবে?

(গ) কবি নওজোয়ানদের কি করিতে বলিয়াছেন?

৫। নিচের শূন্যস্থানগুলি বিশেষ্যের সাহায্যে পূর্ণ কর ঃ

(ক) নব নবীনের গাহিয়া——। (খ) সজীব করিব মহা——। (গ) আমরা দানিব নতুন——।



বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি

—জীবনানন্দ দাশ

[বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের কবি জীবনানন্দ দাশ আধুনিক বাঙ্গালী কবিদিগের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। বাংলার মাঠ, ঘাট, নদনদী, গাছপালার সৌন্দর্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। ইহারই মধ্যে তিনি চিরন্তন সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করিয়াছেন। আলোচ্য কবিতায় তিনি বাংলার রূপের মধ্যে পৃথিবীর রূপকে দেখিয়াছেন, বাংলার অশ্বত্থ, বট, হিজল, ধানক্ষেতের বিচিত্র সুন্দর, শান্ত-শ্যামল, কোমল-করুণ রূপটি আবিষ্কার করিয়াছেন।]

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দয়েল পাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম—বট—কাঁঠালের—হিজলের—অশথের ক'রে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে!
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল—বট—তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
দেখেছিলো ; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণাদ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিলো, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিলো,—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিলো ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১। কবিতাটি মুখস্থ কর, ও ছন্দ-মাত্রা ঠিক করিয়া আবৃত্তি কর।

২। 'বাংলার রূপ............যাই না আর'—পংক্তির মধ্যে—কবি বাংলার যে রূপ দেখিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন তাহা কিরূপ?

৩। এই কবিতায় বাংলাদেশের গাছ, পাখি, নদী, শস্য, ফুল ইত্যাদির কি পরিচয় পাওয়া যায়?

৪। নীচের বাক্যাংশগুলির অর্থ পরিস্ফুট কর :—

'ছাতার মতন বড়ো পাতাটি', 'ভোরের দয়েল পাখি', 'পল্লবের স্তূপ.........করে আছে চুপ', 'হিজল, বট, তমালের............অপরূপ রূপ', কৃষ্ণাদ্বাদশীর.........মরিয়া গেছে', 'শ্যামার নরম গান', 'অমরায় গিয়ে............মতো', 'ঘুঙুরের মতো............কেঁদেছিল পায়'।

৫। চাঁদ আর বেহুলা বাংলার কোন্ রূপ, কিভাবে দেখিয়াছিল? কবির দেখা বাংলার রূপের সঙ্গে ইহার পার্থক্য কোথায়?

৬। অন্তর্নিহিত ভাব বিস্তারিত করিয়া লিখ :—

(ক) 'বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল............কেঁদেছিল পায়।'

(খ) 'কৃষ্ণাদ্বাদশীর............শ্যামার নরম গান শুনেছিল।'

৭। অর্থ লিখ :— পল্লবের স্তূপ, অপরূপ রূপ, কৃষ্ণাদ্বাদশীর জ্যোৎস্না, সোনালি ধান, অমরা।

৮। টীকা লিখ :— ইন্দ্রের সভা, চাঁদ, বেহুলা, মধুকর ডিঙা, কৃষ্ণাদ্বাদশীর জ্যোৎস্না।

৯। বাক্য রচনা কর :— অসংখ্য, ছিন্ন, নরম গান, সোনালি ধান, নীল ছায়া, অপরূপ রূপ, পৃথিবীর রূপ, পল্লবের স্তূপ।

১০। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :—বাংলার রূপ আমি দেখিয়াছি। চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ। একদিন অমরায় গিয়ে। ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।



—সুকান্ত ভট্টাচার্য

[কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। খুব অল্প বয়সে তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং তাঁহার কবি প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের পূর্বেই খুব অল্প বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। আর্ত, পীড়িত মানবের অন্তর বেদনা তাঁহার কবিতার প্রধান উপজীব্য। বহু পতন-উত্থান-অভ্যুদয়ের ইতিহাসে বিচিত্র তাঁহার স্বদেশ ভারতবর্ষের একটি চিরন্তন, অজেয় সত্তার পরিচয় তিনি তাঁহার 'আমার দেশ' কবিতায় উপস্থিত করিয়াছেন।]

এ আকাশ, এ দিগন্ত, এই মাঠ, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি,
সহস্র বছর ধ'রে একে আমি জানি পরিপাটি,
জানি এ আমার দেশ অজস্র ঐতিহ্য দিয়ে ঘেরা,
এখানে আমার রক্তে বেঁচে আছে পূর্বপুরুষেরা।
যদিও দলিত দেশ, তবু মুক্তি কথা কয় কানে,
যুগ যুগ আমরা যে বেঁচে থাকি পতনে উত্থানে।
যে চাষী কেটেছে ধান, এ মাটিতে নিয়েছে কবর,
এখনো আমার মধ্যে ভেসে আসে তাদের খবর।
অদৃশ্য তাদের স্বপ্নে সমাচ্ছন্ন এদেশের ধূলি,
মাটিতে তাদের স্পর্শ, তাদের কেমন করে ভুলি?
আমার সম্মুখে ক্ষেত, এ প্রান্তর উদয়াস্ত খাটি,
ভালবাসি এ দিগন্ত, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি।

এখানে রক্তের দাগ রেখে গেছে চেঙ্গিস্, তৈমুর,
সে চিহ্নও মুছে দিল কত উচ্চৈঃশ্রবাদের খুর।
কত যুদ্ধ হয়ে গেছে, কত রাজ্য হয়েছে উজাড়,
উর্বর করেছে মাটি কত দিগ্বিজয়ীর হাড়।
তবুও অজেয় এই শতাব্দী-গ্রথিত হিন্দুস্থান,
এরই মধ্যে আমাদের বিকশিত স্বপ্নের সন্ধান।
আজন্ম দেখেছি আমি অদ্ভুত নতুন এক চোখে,
আমার বিশাল দেশ আসমুদ্র ভারতবর্ষকে।

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

১। কবিতাটি মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি কর।

২। এই কবিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে গুছাইয়া লিখ।

৩। 'স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি'—বাক্যাংশে 'স্বপ্ন' শব্দটি ব্যবহারের সার্থকতা কি?

৪। দেশের অতীত ইতিহাসের প্রতি কবির গর্ব ও শ্রদ্ধার ভাবটি কোন্ কোন্ পংক্তিতে কিভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে?

৫। 'যদিও দলিত দেশ, তবু মুক্তি কথা কয় কানে'—পংক্তির মধ্যে কবির বলিষ্ঠ দেশপ্রেমের ভাবটি কিভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে?

৬। 'তাদের কেমন করে ভুলি?'—কবি 'তাদের' বলিতে কাহাদের কথা বলিয়াছেন? তাহাদের তিনি ভুলিতে পারেন না কেন?

৭। 'ভালবাসি এ দিগন্ত'—কবির এই ভালবাসা কি নিছক ভাব কল্পনা, না ইহার সহিত বাস্তবতার কোন সম্পর্ক আছে?

৮। 'তবুও অজেয় এই শতাব্দী গ্রথিত হিন্দুস্থান'—পংক্তি মধ্যে—'তবুও' কথাটি কোন্ প্রসঙ্গ নির্দেশ করে? 'শতাব্দী গ্রথিত হিন্দুস্থান' কথার অর্থ কি? এই হিন্দুস্থান কি অর্থে অজেয়?

৯। কবির ভারতবর্ষকে দেখার 'অদ্ভুত নতুন এক চোখটি' কি রকম?

১০। অর্থ লিখ :— পরিপাটি; ঐতিহ্য; দলিত, পতনে উত্থানে; সমাচ্ছন্ন; উদয়াস্ত; দিগন্ত; উজাড়; দিগ্বিজয়ী; বিকশিত; আসমুদ্র।

১১। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :— উত্থান; উদয়াস্ত; সম্মুখ; সমাচ্ছন্ন; দিগ্বিজয়ী; শতাব্দী।

১২। টীকা লিখ :— চেঙ্গিস; তৈমুর; উচ্চৈঃশ্রবা।

১৩। 'আমার দেশ'—বিষয় অবলম্বন করিয়া ১০।১২ পংক্তির মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ রচনা কর।
